ভিকটিমই দায়ী

মানবাধিকারকর্মীদের রক্ষায় বাংলাদেশের ব্যর্থতা

ফ্রন্ট লাইন ডিফেন্ডার্স | নভেম্বর ২০১৬

“মানুষের ধারনা– একমাত্র সমস্যা হচ্ছে আমাদের মেরে ফেলা হচ্ছে– উগ্রপন্থীরা মানবাধিকার কর্মীদের মেরে ফেলছে এটাই বোধহয় একমাত্র সমস্যা, কিন্তু কেউ বলছে না যে সরকার আমাদের গ্রেফতার করছে, আমাদের চুপ করিয়ে দেয়ার জন্য নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করছে এবং যখন আমরা হুমকি পেয়ে তাদের জানাচ্ছি তখন তারা আমাদের নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করছে।”

– সমকামী অধিকারকর্মী, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ভূমিকা..... ৪

মূল অনুসিদ্ধান্তসমূহ..... ৫

পটভূমি..... ৭

মানবাধিকারকর্মীদের হত্যাকাণ্ড..... ৯

হুমকি..... ১১

বাক্-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আইনি প্রতিবন্ধকতা..... ১৩

২০১৩ সালে আইসিটি আইনে আনা সংশোধনী..... ১৩

২০১৬ ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট..... ১৪

সুরক্ষা প্রদানে অস্বীকৃতি..... ১৬

মানবাধিকারকর্মীদের ওপর প্রভাব..... ১৬

নির্বাসন..... ১৬

স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপ..... ১৬

মানবাধিকারকর্মীদের নেটওয়ার্কে ভাঙ্গন..... ২৩

মানবাধিকার নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে..... ২৩

মানবাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে..... ২৩

মানবাধিকারকর্মীদের মাঝে বিশ্বাস ও সম্পৃক্ততার অভাব..... ২৪

মানবাধিকার সংক্রান্ত লেখার প্রচার হ্রাস..... ২৪

বিপন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পাওয়া..... ২৫

সুপারিশমালা..... ২৭

কাভারের ছবি: ঢাকার পথচিত্র, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের গুলি করে হত্যার প্রতিকী চিত্র
ছবি: ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স

ক. ভূমিকা

ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ১৪ জন মানবাধিকারকর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। অধিকাংশ সময় উপমহাদেশীয় আল-কায়েদার অনুগত স্থানীয় উগ্রপন্থি দলগুলো নারী অধিকার, আদিবাসী অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অন্যান্য মানবাধিকার বিষয়ে লেখালেখিতে সক্রিয় মানবাধিকর্মীদের ওপর হামলার দায় স্বীকার করেছে।

বেশির ভাগ ঘটনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকার সঠিক তদন্তে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশের গুলিতে কিছু অভিযুক্তের মৃত্যুর খবর ব্যতীত এসব হত্যাকাণ্ডের স্বচ্ছ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হয়েছে সামান্যই। ২০১৩ সাল থেকে ধর্মনিরপেক্ষ মতামত এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী মৌলবাদের প্রভাব বিষয়ে সমালোচনার জন্য ব্লগারদের উপর আক্রমন এবং তাদের হত্যা মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য যে মানবাধিকারকর্মীরা কাজ করছেন তাদের জন্য ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কয়েকজন সুপরিচিত মানবাধিকারকর্মী এবং লেখকের মৃত্যুর পরপর সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া বিবৃতিতে হত্যাকাণ্ডের নিন্দার পরিবর্তে হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিবর্গের লেখার সমালোচনা দেখা যায়।

ব্লগার এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানবাধিকারকর্মীরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে ভূমিকা নেয়ার ছয় মাসের মধ্যে ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে একজন ব্লগারকে হত্যা করা হয়। এর পাশাপাশি জাতীয় সংসদ ২০০৬ সালের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের (আইসিটি) সংশোধনী আনে যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে মারাত্মকভাবে খর্ব করে।

> **হত্যা, দায়মুক্তি এবং হুমকির শিকার মানবাধিকারকর্মীদের সুরক্ষায় কর্তৃপক্ষের অস্বীকৃতির ফলস্বরূপ ৪৫ জনের অধিক মানবাধিকারকর্মী ও লেখক এখন হয় মৃত নতুবা নির্বাসিত কিংবা সম্পূর্ণভাবে লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছেন।**

মানবাধিকারকর্মীদের হত্যা, এর প্রেক্ষিতে সরকারের ভূমিকা এবং মানবাধিকারকর্মীদের অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধানের জন্য ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স বাংলাদেশে একটি গবেষনামূলক মিশন পরিচালনা করে।

ওই মিশনের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত এই প্রতিবেদনে ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন মানবাধিকার ইস্যুতে কাজ করা অধিকার কর্মীদের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। মানবাধিকারকর্মীদের সাথে কথোপকথনের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা হয়েছে নারী অধিকার কর্মীদের, সমকামী অধিকার, অভিবাসী শ্রমিক অধিকার, আদিবাসী অধিকার, শ্রমিক অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার এবং শিক্ষাচর্চার স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা মানবাধিকারকর্মীদের। হত্যার শিকার মানবাধিকারকর্মীদের পরিবার ও সহকর্মীদের, এখনো বাংলাদেশে অবস্থানকারী সক্রিয় মানবাধিকারকর্মীদের এবং যারা নির্বাসনে রয়েছেন তাদের সাক্ষ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশী ও বিদেশী সাংবাদিক, আইন বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদদের প্রদত্ত সাক্ষ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

> *“ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার যুক্তি দেখিয়ে এ হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটানো হয়, কিন্তু এর তো নানা অর্থ হতে পারে– আমি কেমন পোশাক পরি, আমি যে কপালে টিপ পরি সেটাও একজন ধার্মিক ব্যাক্তি যিনি বিশ্বাস করেন যে নারীদের পর্দার আড়ালে থাকা উচিত– তার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে। এমনকি গণপরিসরে নারীকে দেখতে পাওয়াটাও অনেকের কাছে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার কারণ হতে পারে।*
>
> ***ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার নামে যদি হামলা, হয়রানি, হত্যা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেয়া হয়; তাহলে নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতা খুবই বিপন্ন হয়ে পড়ে।”*** *– সুলতানা কামাল, মানবাধিকারকর্মী, বাংলাদেশ*

খ. মূল অনুসিদ্ধান্তসমূহ

বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করা মানবাধিকারকর্মীদের ভাষ্যমতে হত্যা, হুমকিপ্রাপ্ত কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতা এবং অপরাধীদের দায়মুক্তি তাদের কাজকে ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিম্নরূপঃ-

- **কাজের পরিবেশ সংকুচিত:** ঢাকায় অবস্থানরত প্রায় ১০ ধরনের মানবাধিকার ইস্যুতে যেমন: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার, অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, নারীর অধিকার, অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার, শ্রমিকের অধিকার, লৈঙ্গিক সংখ্যালঘুদের অধিকার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, পুলিশের নিষ্ঠুরতা, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম এবং যৌন ও প্রজনন অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করা মানবাধিকার কর্মীদের ভাষ্য– তাদের প্রকাশ্য আন্দোলন এবং অনলাইনে লেখালেখি কমে গেছে।

- **সুরক্ষার অভাব:** ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স ঝুঁকিপূর্ণ মানবাধিকার কর্মীদের সুরক্ষায় কর্তৃপক্ষের ব্যাপকমাত্রার ব্যর্থতা লিপিবদ্ধ করেছে। এখনো দেশে অবস্থানকারী মানবাধিকারকর্মী, যারা বিদেশে নির্বাসিত তারা এবং হত্যার শিকার মানবাধিকারকর্মীদের আত্মীয়-স্বজনরা বলেছেন যে, হত্যাকাণ্ডের শিকার মানবাধিকারকর্মীদের মৃত্যুর আশঙ্কা ও হুমকি সম্পর্কে পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও পুলিশ তাদের নিরাপত্তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। হামলার বা হত্যাকাণ্ডের শিকার বেশ কয়েকজন মানবাধিকারকর্মীর পরিবারের সদস্যরা বলেছেন যে, হামলা বা হত্যাকাণ্ডের অন্তত ছয়মাস আগে তারা পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন কিন্তু অঘটন এড়ানো যায়নি।

- **তদন্তে অস্বীকৃতি:** হত্যার হুমকি বা হয়রানীর প্রেক্ষিতে মানবাধিকারকর্মীরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেছে। এমনকি সাধারণ নথিভুক্তির ক্ষেত্রেও অনেক সময় পুলিশ তাদের অন্য থানায় যেতে বলেছে। কিন্তু সেখানেও তাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়নি। পুলিশ অনেক মানবাধিকারকর্মীকেই (যারা পরবর্তী সময়ে হামলা ও হত্যার শিকার হয়েছিল) দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলেছিল যখন তারা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিল এবং নিরাপত্তা চেয়েছিল। অনেকেকেই বলা হয়েছিল, "আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না, আপনি একজন ব্লগার।"

- **নির্বাসন:** হত্যা ও সহিংস হামলার ঘটনা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মানবাধিকারকর্মীদের বিদেশে স্বেচ্ছানির্বাসনে যাওয়ার প্রবণতা ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। কথিত 'হিট লিস্ট'-এ অন্তর্ভুক্ত মানবাধিকারকর্মীদের মধ্যে অন্তত পক্ষে ২৫জন দেশের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন বলে ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স এবং তার শরীক সংগঠনগুলো তথ্যভুক্ত করেছে। এদের মধ্যে অনেকেই দেশ ছাড়ার আগে সরাসরি হুমকি পেয়েছেন, হামলার শিকার হয়েছেন অথবা পুলিশের কাছে সুরক্ষা চেয়েও পাননি।

- **স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপ:** যে মানবাধিকারকর্মীদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই ২০১৩ সাল থেকে স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপ মেনে চলছেন। মানবাধিকারকর্মীরা যারা দেশ ছাড়তে ইচ্ছুক নন বা সক্ষম ছিলেন না– বিশেষত যাদের নাম "হিট লিস্টে" প্রকাশিত হয়েছিল– তাদের বেশিরভাগই প্রিন্ট এবং অনলাইন প্লাটফর্মে লেখালেখি কমিয়ে দিয়েছেন, এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহেও তাদের পোস্ট বা লেখালেখি কমে গেছে।[১] মানবাধিকারকর্মীদের মতে, যারা মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নারী অধিকার, শ্রমিক অধিকার, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার, ধর্মের অধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে লেখালেখি করতেন তাদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ২০১৩ সালে বাক-স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইনে বর্ধিত শাস্তিমূলক বিধান অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের সহকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মানবাধিকারকর্মীদের আইনি হয়রানির আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

১ ২০১৩ সালে উগ্রপন্থীরা "ইসলামের শত্রু" নামে ৮৪ জনের একটি তালিকা সরকারকে দেয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। ২০১৫ সালে, আরেকটি তালিকা আনসারুল্লাহ বাংলা টিম প্রকাশ করে এবং তাদের দাবি পুরন না হলে তালিকাভূক্তদের মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়।

- অরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীগোষ্ঠী কর্তৃক শারীরিক হামলা এবং সরকার কর্তৃক আইনগত হয়রানি উভয় থেকে নিজেদের এবং তাদের সহকর্মীদের রক্ষার্থে মানবাধিকারকর্মীরা তাদের **কাজ কমিয়ে দিচ্ছেন বা বন্ধ করে দিচ্ছেন**। কারো কারো মতে, সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের লেখালেখি কমানোর কারণ ছিল অন্য লেখকদের শারীরিক হামলা থেকে রক্ষা করা। একইভাবে, খসড়া 'ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট' যা কোন সংগঠনের একজন সদস্যের মতামত প্রকাশ সম্পর্কিত অপরাধের জন্য পুরো সংগঠনকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে– আলোচনায় আসার পর মানবাধিকারকর্মীরা সম্ভাব্য আইনি হয়রানী থেকে নিজেদের এবং নিজেদের নেটওয়ার্ককে রক্ষার জন্য স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপ অবলম্বন করছেন।

- **মানবাধিকার কর্মীদের পরিবারের জন্য হুমকি:** নারী মানবাধিকার কর্মীরা তাদের সন্তানদের বিষয়ে হুমকি পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। এখন পর্যন্ত যেহেতু শুধু পুরুষরাই হামলার শিকার হয়েছেন তাই তাদের ছেলে সন্তানরা সহজেই আক্রমণের শিকার হতে পারে বলে তারা মনে করেন।

- **নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে পড়া:** হত্যাকাণ্ডসমূহ মানবাধিকার আন্দোলনের নেটওয়ার্কে বড় ধরনের ভাঙ্গন ঘটিয়েছে। মানবাধিকারকর্মীরা জানিয়েছে– অধিকারভিত্তিক যে নেটওয়ার্কগুলো ছিল এবং ইস্যুভিত্তিক যে নেটওয়ার্কগুলো ছিল তা ভেঙ্গে গেছে। হত্যাকাণ্ডসমূহের পর মানবাধিকার কর্মীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নানা ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেমন: ফোন নাম্বার পরিবর্তন, বাসা বদল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রোফাইল বদল ইত্যাদি– যার ফলে মানবাধিকারকর্মীদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ কমে গেছে। সমকামী অধিকার কর্মীরা নিরাপত্তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ কমিয়ে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন।

- **কলঙ্কিতকরণ:** বেঁচে যাওয়া মানবাধিকার কর্মীরা যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার মানবাধিকার কর্মীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতেন বা একই ধরনের ইস্যুতে কাজ করতেন, তাদের অবস্থা এখন 'সমাজচ্যুত' ব্যক্তিদের মত। মানবাধিকার কর্মীরা যারা পূর্বে সামাজিকভাবে এবং বিভিন্ন সংগঠনে সম্মানজনক অবস্থানে ছিলেন তাদের এখন "অন্যতম বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।"[২]

- মানবাধিকারকর্মীরা পূর্বে যে সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতেন, এসব হত্যাকাণ্ডের পর তারা প্রায় **বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন** বলে অভিযোগ করেছেন। ২০১৪ সালে সমকামী অধিকার আন্দোলন কর্মীদের দ্বারা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ৫০০'র বেশি অংশগ্রহণকারী ছিল। কিন্তু ২০১৬ সালে মানবাধিকারকর্মী জুলহাস মান্নানের হত্যাকাণ্ডের পর সমকামী অধিকার কর্মীরা কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা চিন্তাও করতে পারেন না। এমনকি কর্মীরা একে অন্যের সাথে সামাজিক যাগাযোগ মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ভয়ের মধ্যে রয়েছেন।

- আদিবাসী অধিকার কর্মীরা এখন প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকায় যাওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে চলছেন। **রাজধানীতে বঞ্চিত আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধিত্বের** বিষয়টিও সীমিত হয়ে আসছে। ঢাকার বাইরে প্রত্যন্ত এলাকাবাসীর মতে, তাদের ইস্যুতে বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের সোচ্চার ভূমিকা হ্রাসের কারণে আদিবাসী এলাকায় জমি দখল এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বেড়ে গেছে।

যতজন মানবাধিকারকর্মীর সাথে ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স কথা বলেছে তাদের বক্তব্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এসব হত্যাকাণ্ড তাদের কাজকে যতটা বাধাগ্রস্ত করেছে বা তাদেও কাজের ধরন বদলাতে বাধ্য করেছে, হুমকিপ্রাপ্ত মানবাধিকারকর্মীদের সুরক্ষার অভাব, হামলার ঘটনার শিকার বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দোষারোপ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ বেড়ে যাওয়া মানবাধিকারকর্মীদের কাজকে তার চাইতেও অনেক বেশি সীমিত ও বাধাগ্রস্ত করেছে।

যেসব মানবাধিকারকর্মীর বক্তব্য নেয়া হয়েছে তাদের মতে– হুমকি ও হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে সরকারের ভূমিকায় এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তারাও যদি হুমকির শিকার হন, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাদের রক্ষায় এগিয়ে আসবে না এবং তাদের নিজের মৃত্যুর জন্য তাদেরকেই অভিযুক্ত করা হবে।

২ ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স এর সাথে ঢাকায় একজন সমকামী অধিকার আন্দোলন কর্মীর সাক্ষাৎকার। সেপ্টেম্বর ২০১৬।

গ. পটভূমি

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয় মাসে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী শতশত সাধারণ মানুষকে হত্যা করে এবং অসংখ্য বাঙ্গালী নারীদের ধর্ষণসহ অন্যান্য যুদ্ধাপরাধ সংঘটন করে।[৩] সে সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের অপরাধকর্মে জামায়াত-ই-ইসলামী (বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় একটি ইসলামিক দল)-এর সদস্যসহ পাকিস্তান সমর্থকদের সহায়তা পেয়েছিল।

২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় বর্তমানে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামীলীগ ১৯৭১ সালে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে। ২০১২ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জামায়াত-ই-ইসলামীর নয় নেতা এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের দুই নেতাকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করে।[৪]

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ট্রাইব্যুনালের একটি রায়ের প্রেক্ষিতে ঢাকার শাহবাগ চত্বরে প্রতিবাদ শুরু হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জামায়াত-ই-ইসলামী দলের প্রবীন নেতা আব্দুল কাদের মোল্লাকে আনীত ছয়টি অভিযোগের মধ্যে পাঁচটিতে অভিযুক্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। আদালত থেকে বেরিয়ে কাদের মোল্লা 'বিজয় চিহ্ন' দেখান। যুদ্ধাপরাধের বিচারের পক্ষের তরুণরা এ ঘটনাকে সরকারের সঙ্গে জামায়াত-ই-ইসলামীর আপোষের ইঙ্গিত হিসেবে চিহ্নিত করে কাদের মোল্লার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে শাহবাগে প্রতিবাদ শুরু করে। বহু আন্দোলনকারীর মতে এটা নিশ্চিত যে পরবর্তী নির্বাচনে যদি বিরোধীদল ক্ষমতায় আসে তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্তরা মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসবেন। কেউ কেউ মৃত্যুদণ্ডের বিপরীতে নৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করলেও আন্দোলনকারীদের দাবীকে "বাংলাদেশে বিদ্যমান স্থায়ী শাস্তি" বলে অভিহিত করেন।[৫] অন্যদের মন্তব্য ছিল– "যতদিন বাংলাদেশের আইন পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড আছে, এর চেয়ে কম শাস্তি তারা যে অপরাধ করেছিল তার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ"।

২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, জামায়াত-ই-ইসলামীর সহ সভাপতি দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয় ট্রাইব্যুনাল। এর প্রতিবাদে জামায়াত সমর্থকরা হরতাল-অবরোধ ঘোষণা করে এবং সহিংস আন্দোলন শুরু করে।[৬] এর প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলন প্রতিহত করতে পুলিশ মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার মতে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে এসময় কয়েক ডজন ব্যক্তি নিহত হয় এবং অভিযানের সময় শতাধিক আন্দোলনকারী আহত হয়।

মে মাসের শুরুর দিকে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম দল হেফাজত-ই-ইসলামের হাজার হাজার সমর্থক কঠোর ধর্মীয় আইনের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে। হেফাজতের কর্মীরা শাহবাগের আন্দোলনকারীদের মৃত্যুদণ্ড, নারী অধিকারের ক্ষেত্র সীমিত করা এবং ধর্মের বিরুদ্ধাচারণের জন্য শাস্তিমূলক আইন প্রণয়নের দাবী জানায়। ঢাকায় তাদের আন্দোলন এক পর্যায়ে সহিংস রূপ নেয় এবং পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষে প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু এবং শতাধিক আহতের ঘটনা ঘটে।[৭]

শাহবাগ আন্দোলনের দ্বিতীয় সপ্তাহে, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তে ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দারকে শাহবাগ থেকে বাড়ি ফেরার পথে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। রাজীব হায়দার 'থাবা বাবা' ছদ্মনামে ধর্মীয় উগ্রবাদের বিরুদ্ধে লিখতেন। সামহোয়ার ইন ব্লগ, আমার ব্লগ ডটকম এবং নাগরিক ব্লগ ডটকম-এ তিনি লিখতেন।

রাজীব হায়দার ডজনেরও বেশি হত্যাকাণ্ডের শিকারদের মধ্যে প্রথম। এসব হত্যাকাণ্ডের বেশিরভাগ ঘটে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে। লক্ষ্য ছিল– ইসলাম ধর্মের সমালোচনাকারী বা বিরুদ্ধতাকারী লেখকরা। সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা শুরুতে রাজীব হায়দারের হত্যাকাণ্ডে নিন্দা জ্ঞাপন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমনকি তাকে শহীদ বলেও আখ্যায়িত করেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করেন। কিন্তু রাজীব হায়দারের ইসলাম ধর্ম সম্পর্ক সমালোচনামূলক লেখাসমূহ যত বেশি পুনঃপ্রকাশিত হতে

---

৩ http://www.womenundersiegeproject.org/conflicts/profile/bangladesh#numbers

৪ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে ব্যর্থতার জন্য বাংলাদেশ সরকার ব্যাপকভাবে সমালোচিত। সমালোচনার বিষয়বস্তু ছিল অনিয়ম, পক্ষপাতিত্ব, মামলার কিছু রায় বিবাদীপক্ষের সাক্ষীকে সাক্ষ্যের জন্য অনুমতি না দিয়ে ঘোষণা বা এমন প্রমাণকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না।

৫ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠিত যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচারের প্রেক্ষিতে সংগটিত শাহবাগ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এমন কয়েকজনের বক্তব্য গ্রহণ করেছে ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স।

৬ http://www.thedailystar.net/news-detail-270972

৭ http://www.askbd.org/ask/wp-content/uploads/2014/08/Human-Rights-Violation-Report-2013.pdf

থাকে ততই সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন আসতে থাকে।[৮] বিরোধীদলের এবং কিছু গণমাধ্যমের প্রচারণার কারণে, সরকারের প্রতিনিধিদল এবং একজন ইমাম শেষমুহূর্তে রাজীব হায়দারের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বাতিল করে।[৯] পরবর্তী হত্যাকাণ্ডগুলোর পর সরকারের প্রতিনিধিরা অনলাইনে লেখালেখি সীমিত করার আহ্বান জানাতে থাকেন যা এসব হত্যাকাণ্ড বিষয়ে সরকারের অবস্থানের সাক্ষ্য বহন করে।

রাজীব হায়দার হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সময়ে, 'ব্লগার' পরিচয়টি সম্মানজনক অবস্থান থেকে বিপজ্জনক উপাধিতে পরিণত হয়। কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষক, অধিকারকর্মী এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, ধর্মীয় উগ্রবাদীরা রাজীব হায়দারকে প্রথম টার্গেট হিসেবে চিহ্নিত করে কারণ শাহবাগ আন্দোলনে সম্পৃক্তদের মধ্যে তার লেখাগুলো তুলনামূলকভাবে ইসলাম ধর্মের প্রতি বেশি আক্রমণাত্মক ছিল।

শাহবাগ আন্দোলনের বিরোধীরা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনে ব্লগার শব্দটি 'ইসলাম বিরোধী'র সমার্থক হিসেবে সহজেই পরিচিত করাতে সমর্থ হয়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে 'ব্লগার' আর 'ইসলামবিরোধী শব্দদু'টি পরিপূরক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। মানবাধিকারকর্মী– যারা বিভিন্ন অধিকার ইস্যুতে ব্লগ এবং অনলাইন মাধ্যমে সোচ্চার তারা কি নিয়ে লেখালেখি করছেন সেটা যাচাই না করেই বেশিরভাগ সময় তাদেরকে 'ইসলামবিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

হেফাজতের মতো ইসলামী দলগুলো যখন আন্দোলন করছিল তখন ব্লগারদের লেখালেখিকে ধর্মবিরোধী লেখা হিসেবে অভিহিত করে এবং শ্লোগান দেয়– 'আল্লাহ মহান– নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তি চাই।'[১০] মাঝে মাঝে তাদের শ্লোগানে নাস্তিক শব্দটিও থাকত না– অর্থাৎ 'ব্লগারদের শাস্তি চাই'। এর অর্থ– ব্লগিং বিষয়টিই অপরাধ, তারা কী বিষয়ে লিখছে সেটি অপ্রাসঙ্গিক। এই অবস্থা এমন প্রেক্ষিত তৈরি করে যে মানবাধিকারকর্মী যারা ব্লগিং বা ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে মানবাধিকার ইস্যুতে মতামত প্রকাশ করতেন তারাও উগ্রবাদিদের হামলা অথবা সরকার কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হন শুধু এ কারণে যে তারা ব্লগ বা ফেসবুক ব্যবহার করেন।

যখন সরকার ২০১৩ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে (আইসিটি অ্যাক্ট) সংশোধন এনে মত প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করে তখন তা এ বার্তা প্রদান করে যে ব্লগিং একটি গর্হিত কাজ।[১১] ব্লগারদের ব্যাপারে এই নেতিবাচক মনোভাব সরকারকে নিহত ব্লগারদের লেখালেখির সমালোচনা করা এবং যারা এখনো লেখালেখিতে সক্রিয় তাদের আটক করার সুযোগ করে দিয়েছে। আর এ কারণেই ব্লগারদের হত্যাকাণ্ড ও আটকের পরও তেমন কোন জোরালো প্রতিবাদ দেখা যায় না।

ব্লগারদের ওপর হামলা এবং তাদের হত্যাকাণ্ডের পর সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা হামলা ও হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করার পরিবর্তে ব্লগারদের লেখালেখি বিষয়ে আরো সতর্ক হবার পরামর্শ দেয়ার বিষয়টিকে অনেক মানবাধিকারকর্মী 'আক্রান্ত ব্যক্তিকে দোষারোপ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। মানবাধিকারকর্মী নিলয় নীলের হত্যাকাণ্ডের পর এক মাসও হয়নি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক বক্তৃতায় বলেন; "ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কিছু বলার অধিকার এ দেশে কারোরই নেই।"[১২]

৮ http://www.newyorker.com/magazine/2015/12/21/the-hit-list; http://www.thedailystar.net/news-detail-269450
৯ http://www.thedailystar.net/news-detail-269421; http://www.thedailystar.net/news-detail-269751
১০ https://www.rt.com/news/bangladesh-protest-muslim-blogger-431/; http://www.thedailystar.net/news-detail-270122
১১ https://advox.globalvoices.org/2013/09/18/bangladeshs-ict-act-stoops-to-new-lows/
১২ http://bdnews24.com/bangladesh/2015/09/03/prime-minister-hasina-says-hurting-religious-sensitivities-will-not-beaccepted

ঘ. মানবাধিকারকর্মীদের হত্যাকাণ্ড

বাংলাদেশের সুপরিচিত লেখক এবং মানবাধিকারকর্মী যারা লৈঙ্গিক সমতা ও সমঅধিকার, ধর্মের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করতেন তারা ২০১৩ সাল থেকে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। ২০১৩ সাল থেকে প্রায় ২৪ জন মানবাধিকারকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। নীচের তালিকা এসব হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ তালিকা নয়, কিছু উদাহরণমাত্র–

অভিজিৎ রায়

২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি একুশে বইমেলা থেকে স্ত্রী ও সহকর্মী বন্যা আহমেদের সাথে বাড়ী ফেরার পথে লেখক ও প্রকৌশলী ড. অভিজিৎ রায়ের ওপর দুজন ব্যক্তি আক্রমণ চালায় এবং তাকে হত্যা করে। অভিজিৎ রায় যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিক এবং আলোচিত ব্লগ 'মুক্তমনা'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি দশটি বইয়ের লেখক ছিলেন। বন্যা আহমেদ তার স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে কাঁধে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং তার বাম হাতের আঙ্গুল কাটা পড়ে। অভিজিৎ রায় সে রাতে হাসপাতালে মারা যান এবং বন্যা আহমেদ বেঁচে যান। "আনসার বাংলা ৭" নামের একটি গ্রুপ উক্ত হামলার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দেয়। অভিজিৎ রায়ের ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবাধিকার বিষয়ক লেখালেখিকে তারা 'ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে অভিহিত করে। মৃত্যুর পূর্বে অভিজিত রায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মৃত্যুর হুমকি পেয়েছিলেন।

ওয়াসেকুর রহমান

২০১৫ সালের ৩০ মার্চ, ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় মানবাধিকারকর্মী ও ব্লগার ওয়াসেকুর রহমানের হত্যাকাণ্ড ঘটে। তিনজন যুবক তাকে ঘিরে ফেলে এবং চাপাতি দিয়ে মুখ, গলা ও কপালে আঘাত করে। পুলিশ ঘটনাস্থলের কাছাকাছি এলাকা থেকে দুজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চাপাতিসহ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা জানায় যে, তারা ওয়াসেকুর রহমানকে 'ইসলাম বিরোধী' লেখালেখির জন্য হত্যা করেছে। রহমান 'কুৎসিত হাঁসের ছানা' ছদ্মনামে ব্লগে লৈঙ্গিক সমতা, নারী অধিকার লঙ্ঘন এবং বাংলাদেশের আইন পদ্ধতিতে ইসলাম ধর্মের চরমপন্থী ভূমিকা বিষয়ে লেখালেখি করতেন। মৃত্যুর পূর্বে ওয়াসেকুর রহমান অনেকবার মৃত্যুহুমকি পেয়েছিলেন।

অনন্ত বিজয় দাস

১২ মে ২০১৫ সিলেটে অফিসে যাওয়ার পথে মুখোশধারী ব্যক্তিরা চাপাতি দিয়ে মানবাধিকারকর্মী ও ব্লগার অনন্ত বিজয় দাস-এর মাথা ও শরীরের উপরিভাগে আঘাত করে। অনন্ত বিজয় দাস, অভিজিৎ রায় সম্পাদিত 'মুক্তমনা' ব্লগে লিখতেন। ২০০৬ সালে তিনি মানবতাবাদী চিন্তা ও বার্তার প্রসারে ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তমনা বার্ষিক পুরস্কার পান। আল-কায়েদার ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত সন্ত্রাসী দল আনসার আল ইসলাম (আনসারুল্লাহ বাংলা দল নামও পরিচিত) অনন্ত বিজয় দাস হত্যার দায় স্বীকার করে। অনন্ত বিজয়ও মৃত্যুর পূর্বে হুমকি পেয়েছিলেন।

নিলয় চট্টোপাধ্যায়

২০১৫ সালের ৭ আগস্ট ঢাকায়, একদল ব্যক্তি ব্লগার ও মানবাধিকারকর্মী নিলয় চট্টোপাধ্যায়কে (ছদ্মনাম 'নিলয় নীল') নিজ বাড়িতে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। নীল 'মুক্তমনা' ব্লগের অন্যতম লেখক ছিলেন। তিনি মানবাধিকার, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং বাংলাদেশে নারী অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের চরমপন্থী রূপ বিষয়ে লেখালেখি করতেন। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া মানবাধিকারকর্মী ও লেখকদের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। এসব হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবীতে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন এবং প্রতিবাদেও যুক্ত ছিলেন। নিলয় 'বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ' এর একজন সংগঠক ছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি হুমকি পেয়েছিলেন এবং তাকে কেউ অনুসরণ করছে-এ বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করেছিলেন।

জুলহাজ মান্নান এবং মাহবুব তনয়

২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল ঢাকার কলাবাগানে নিজ এপার্টমেন্টে কিছু সশস্ত্র ব্যক্তি মানবাধিকারকর্মী জুলহাজ মান্নান এবং মাহবুব তনয়ের ওপর হামলা চালায়। গলায় ও ঘাড়ে ছুরির গভীর ক্ষতের কারণে তাদের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে। জুলহাজ মান্নান এবং মাহবুব তনয় উভয়ে সমকামী অধিকারকর্মী ছিলেন এবং ২০১৪ সালে প্রকাশিত লৈঙ্গিক অধিকার সম্পর্কিত বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা 'রূপবান' এর সাথে যুক্ত ছিলেন। এ পত্রিকা বাংলাদেশের মানুষের মাঝে লৈঙ্গিক বৈচিত্র ও অধিকার এবং এ বিষয়ে সহনশীলতা তৈরিতে ভূমিকা রাখে। হত্যাকাণ্ডের সময় জুলহাস মান্নান ইউএসএইড-এ কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসের প্রটোকল অফিসার হিসেবে সাত বছর দায়িত্ব পালন করেন। মাহবুব তনয় একটি নাটকের দলে কাজ করতেন। উভয়েই ২০১৪ সাল থেকে প্রতিবছর ১৪ এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সমকামীদের বার্ষিক 'রেইনবো র‍্যালী' (রংধনু মেলা) আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

২০১৬ সালের ১৪ এপ্রিল আটক চার অধিকারকর্মীর মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে জুলহাজ মান্নান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ১৪ এপ্রিল থেকে তার হত্যাকাণ্ডের দিন– এই দশ দিনে তিনি বহু বার ফোনে মৃত্যুর হুমকি পান বলে বন্ধুদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু সমকামী অধিকারকর্মীদের প্রতি পুলিশের আচরণ দেখে এ বিষয়ে পুলিশকে কিছু জানাননি।

"জুলহাজই আমার মানবাধিকার সম্পর্কিত কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণ ছিল। তিনি ছিলেন আমার অনুপ্রেরনা।

জুলহাজ মান্নান. ছবি: ফেসবুক থেকে সংগৃহীত

জুলহাজ মান্নানের মৃত্যুতে তাদের আন্দোলনে যে ক্ষতি হয়েছে তা ব্যক্ত করতে গিয়ে একজন অধিকারকর্মী ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্সকে একথা বলেন।

'মানুষের ধারণা এরকম যে আমাদের মেরে ফেলা হচ্ছে– উগ্রপন্থীরা মানবাধিকার কর্মীদের হত্যা করছে। কিন্তু সরকার যে আমাদের গ্রেফতার করছে, আমাদের চুপ করিয়ে দেয়ার জন্য নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করছে বা আমাদের নিরাপত্তা দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে সেসব সম্পর্কে কেউ কথা বলে না। জুলহাজের হত্যার এক মাস আগে আমাদের চারজন কর্মী গ্রেফতার হয়েছিল এবং আমরা থানায় গিয়েছিলাম তাদের ছাড়িয়ে আনতে। জুলহাজের কারণেই সেদিন আমি সেখানে গিয়েছিলাম– তার জন্য না হলে আমরা কেউই হয়তো সেদিন সেখানে যেতাম না।

জুলহাজ ছিলেন সমকামী অধিকার মঞ্চ ও পত্রিকা "রূপবান" এর সভাপতি। তিনি রূপবান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না– এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। আমাদের কয়েকজন সম্পাদক ছিলেন। আমরা একেকজনকে একেকটা কাজের দায়িত্ব দিতাম। যেমন: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক চালানো, প্রকাশনা, অ্যাডভোকেসি, প্রকাশনা বিতরণ বা অন্যান্য কাজ। জুলহাজ সবাইকে নির্দেশনা দিত এবং সবার প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করত। আমাদের মাঝে সত্যিকার অ্যাকটিভিস্ট না থাকায় জুলহাজ নেতৃত্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত দুটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছিলেন। আমরাও চেয়েছিলাম অধিকারকর্মী হতে। জুলহাজ সর্বদা বলতেন যে তিনি বাংলাদেশে আরও মানবাধিকার কর্মী তৈরি করতে চান। এমন অনেক কর্মী তৈরি করার ইচ্ছা তার ছিল যারা এ কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। জুলহাজ মান্নান হত্যার পর সব থেমে গেল– আমরা সবাই থমকে গেলাম। আমার পরিচিত সকল কর্মী তাদের ফেসবুক বন্ধ করে দিল এবং ফোন নম্বার পরিবর্তন করলো। এখন আমরা কারো সাথে দেখা করতে বা কথা বলতেও ভীত সন্ত্রস্ত।

জুলহাজই আমার মানবাধিকার সম্পর্কিত কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণ ছিল– আমার অনুপ্রেরনা ছিল। তার হত্যাকাণ্ডের পরে আমার প্রথম চিন্তা এমন ছিলো: বাংলাদেশে সমকামী অধিকার কার্যক্রম নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই– আমি শধু জুলহাজের মৃত্যুর কারণ জানতে চাই। কিন্তু এটা আমার আবেগপ্রবন প্রতিক্রিয়া ছিল। বর্তমানে আমি কিছু ছোট বিষয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি– যেমন রূপবান পত্রিকাটি বাংলা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা যাতে আমরা দেশের বাইরে পাঠাতে পারি। কিন্তু যখনই কাজ কিছুটা এগিয়ে নেয়া শুরু করি, তখনই ফোন কল আসা শুরু করে। কেউ যেন আমাকে সাবধান হতে বলে...।

ঙ. হুমকি

ঢাকার মানবাধিকারকর্মীরা অভিযোগ করে যে, মৃত্যু হুমকিসহ অন্যান্য হুমকি এখনো বর্তমান। বেশির ভাগ কর্মীই ২০১৩ সাল থেকে এ ধরনের সরাসরি হুমকি বৃদ্ধির কথা জানান। ফোন কল, ফোনে পাঠানো বা যানবাহনে রেখে যাওয়া বার্তা, ফেসবুকে ব্যক্তিগত বার্তা এবং বিশেষভাবে তাদের ব্লগ ও ফেসবুকে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কিত পোষ্টের মন্তব্য অংশে মানবাধিকারকর্মীরা হুমকি পেয়ে থাকেন।

অরাষ্ট্রীয় এমন উৎস থেকে হুমকি পাওয়ার পাশাপাশি মানবাধিকার কর্মীরা সরকারের তরফ থেকেও হুমকি এবং হয়রানির শিকার হন।

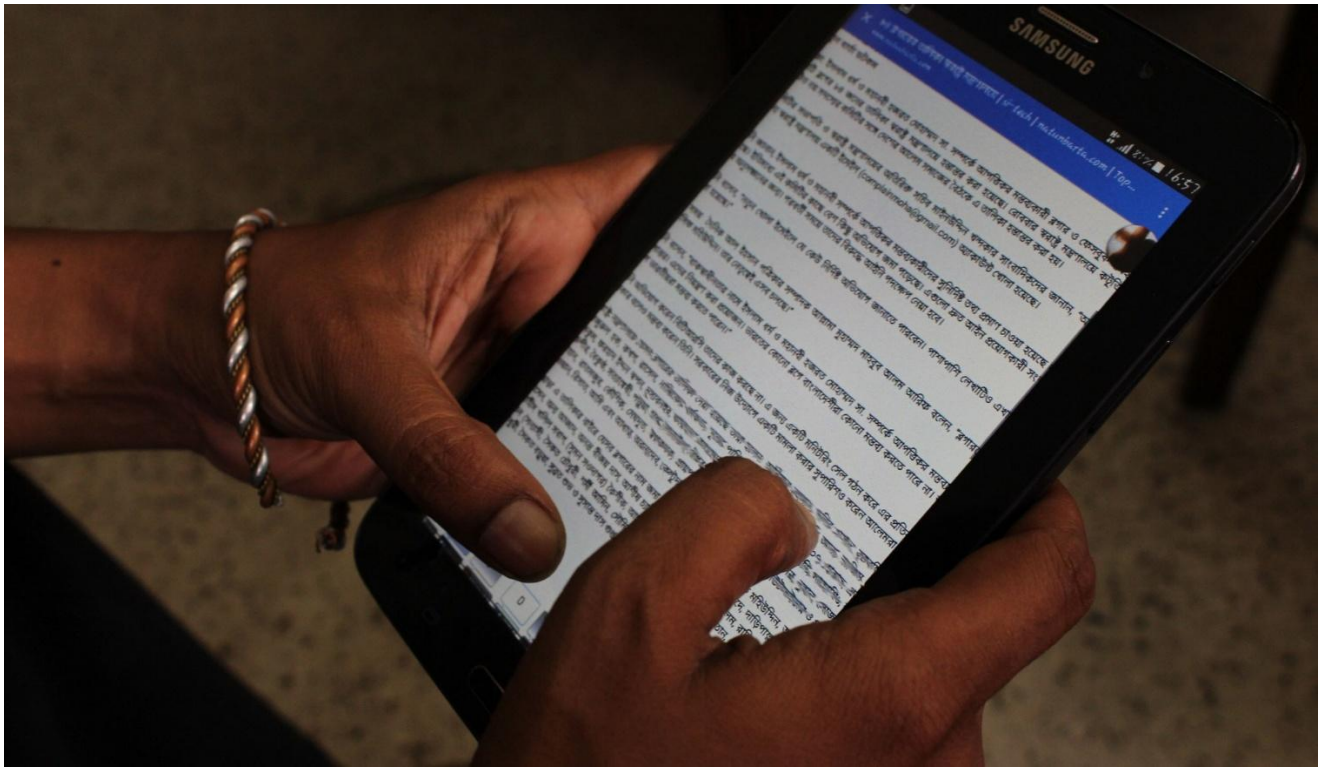

একজন মানবাধিকার কর্মী ২০১৩ সালে প্রকাশিত সেই হিট লিস্টে নিজের নাম দেখাচ্ছেন। ছবি: ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স

জবানবন্দি : সমকামী অধিকারকর্মী

এপ্রিল ২০১৬ তে জুলহাজ মান্নানের হত্যাকাণ্ডের পর তার বহু সহকর্মী ফোন কল ও খুদে বার্তার মাধ্যমে হুমকি পেতে থাকে। ফোন নম্বার পরিবর্তন, বাড়ি বদল এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রোফাইল পরিবর্তন বা বাতিলের পরও এ ধরনের হুমকি অব্যাহত থাকে। সমকামী অধিকারকর্মীরা ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্সকে জানিয়েছেন যে, পুলিশ যেহেতু পূর্বে তাদেও আটক করেছে এবং তাদের কাজ বন্ধ করতে বলেছে তাই তারা মৃত্যু হুমকির কথা পুলিশকে জানান না।

> *জুলহাজকে যখন হত্যা করা হলো, আমরা কয়েক মাসের জন্য সবকিছু বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এখন আমি কিছু কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি: তার কাজ অনুবাদ করা, জুলহাজের সংগ্রাম বিষয়ে কবিতা লেখা ইত্যাদি। আমাকে সব সময় লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে, কিন্তু আমি জানি যে আমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। যখনই আমি আবার ছোট ছোট কাজ শুরুকরলাম, ফোন কল আসা শুরু হয়ে গেলো। অপরিচিত নম্বর থেকে অজানা ব্যক্তি আমাকে সাবধান হতে বলে বা দীর্ঘশ্বাস নেয়ার মতো শব্দ করে ফোন রেখে দেয়। কিন্তু এসব আমি কাকে বলব? পুলিশকে? যারা আমার সহকর্মীদের আটক করেছিল?*

জবানবন্দি: অভিবাসী শ্রমিক অধিকারকর্মী

সুমাইয়া ইসলাম একজন অভিবাসী শ্রমিক অধিকারকর্মী তার সংগঠন বাংলাদেশ অভিবাসী মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন (বোমসা)। বাংলাদেশের যেসব নারী শ্রমিক পারস্য উপসাগরীয় দেশে কাজ করার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে, সেখানে যাওয়ার আগে তিনি তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য প্রশিক্ষন দিয়ে থাকেন।[১৩] উপসাগরীয় দেশে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবাসফেরত অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সাথে সরকারী কর্মকর্তাদের অ্যাডভোকেসি সভাও আয়োজন করেন তিনি। ব্যক্তিগত ও পেশাগত পরিচয়ে সুমাইয়া ইসলাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং টেলিভিশনে বাংলাদেশী নারী অভিবাসী শ্রমিকদে সুরক্ষার জন্য সক্রিয়।[১৪]

সুমাইয়া ইসলাম জানান, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষের অধিকারকর্মী ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা এবং হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ও তার সহকর্মীরা প্রকাশ্যে কথা বলতে বা লৈঙ্গিক সমতা, নারী অধিকার, বাংলাদেশ এবং উপসাগরীয় দেশগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে লিখতে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মতামত পোস্ট করতে আগের মতো স্বাচ্ছন্দবোধ করেন না। ২০১৩ সালের পর থেকে ফেসবুকের মাধ্যমে তাকে শারীরিক হামলাসহ মৃত্যু হুমকি দেয়া হয়েছে বলেও জানান সুমাইয়া ইসলাম। এ কারণে তিনি এবং তার সহকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারী অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত প্রদান বন্ধ করে দেন। এছাড়া অপরিচিত, নতুন খোলা অথবা প্রোফাইল ছাড়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে বন্ধু হবার অনুরোধ পাঠানো বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব অনুরোধে তিনি সাড়া দেননি কারন হত্যাকান্ডের শিকার বাংলাদেশী মানবাধিকার কর্মীরা মৃত্যুর পূর্বে এ ধরনের অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন।

> “২০১৩ সালের পূর্বে আমরা ফেসবুকে অভিবাসী শ্রমিক অধিকার নিয়ে মুক্ত আলোচনা করতে পারতাম, কোন নারী অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নিজের লেখা ও মতামত দিতে পারতাম বা প্রকাশ করতাম– কিন্তু এখন আর নয়। আমরা অভিজিৎ রায়ের মতো ব্লগারকে লৈঙ্গিক সমতা ও মানবাধিকার নিয়ে লেখার কারনে খুন হতে দেখেছি। বিশেষ করে, যদি নারী অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘন কোনোভাবে ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়– আমরা তাতে মন্তব্য করতে পারি না, আমরা আন্দোলন করতে পারি না, আমার মতামত দিতে পারি না। কারণ এর জন্য আমাকে মেরে ফেলা হতে পারে।”

জবানবন্দি : নারী অধিকারকর্মী

সুপ্রীতি ধর একজন সাংবাদিক, নারী অধিকার কর্মী এবং “উইমেন চ্যাপ্টার” নামের একটি অনলাইন প্লাটফর্ম বা মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও ব্লগের মাধ্যমে হুমকিও মৃত্যু হুমকি পান বলে ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্সকে জানান।

২০১৪ এবং ২০১৫ সালে যখন একের পর এক মানবাধিকারকর্মীর হত্যকাণ্ড ঘটছিল, তখন সুপ্রীতি ধর নারী অধিকারের কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে (নারীর যৌনতা এবং বাংলাদেশে ইসলামিক মৌলবাদ) ইত্যাদি বিষয়ে লেখালেখি বন্ধ করে দেন। কিন্তু তার ফেসবুক (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম) পেইজ ও ব্লগে সহিংস হুমকি অব্যাহত ছিল। সুপ্রীতি ধর জানান, নারী অধিকার কর্মীদের কাজের জন্য তাদের সন্তানদের বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কার কারণে তিনি বা তার সহকর্মীরা, বিশেষভাবে যাদের সন্তানসন্ততি রয়েছে, তারা হুমকির বিষয়ে পুলিশকে জানাতে ইচ্ছুক হন।

> “আমাদের মধ্যে বহুসংখ্যক নারী ব্লগার হত্যাকাণ্ডসমূহ শুরু হওয়ার পর হুমকি পেতে শুরু করে, যদিও বেশির ভাগ সহিংস ঘটনাই পুরুষ ব্লগারদের সাথে ঘটেছিল, কিন্তু কিছু নারী ব্লগারও দেশ ত্যাগ করেন। প্রতি সপ্তাহেই কেউ না কেউ আমার বা আমার পরিবারের ক্ষতি করবে বলে ফেসবুকে বার্তা পাঠাত। বিশেষ করে, আমি আমার ছেলের কথা চিন্তা করি। নারী অধিকারকর্মীদের হুমকি দেয়া হয় এভাবে– ‘আমরা জানি তোমার ছেলে কোন স্কুলে যায়, কিভাবে বাড়ি ফেরে।’ দেখুন, যখন একজন পুরুষ লেখক হত্যার শিকার হন, তখন সমাজে তার একটা দৃশ্যমান ও তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন আমরা, নারী কর্মীরা হুমকির শিকার হই, এটা আমাদের পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে। যখন আমি মৃত্যু হুমকি পেতে শুরু করলাম, লোকজন আমাকে বলতে থাকলো, ‘তুমি কিন্তু দুটি সন্তানের দায়িত্বশীল মা। এসব লিখতে যেয়ো না, মৌলবাদী ও উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে যেয়ো না। লেখা বন্ধ করে দাও, না হলে তোমার কারনে তোমার সন্তানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’ এমনভাবে এ ধরনের কথাগুলো আসে যে মনে হয় ধর্মীয় উগ্রবাদীরা যারা আমাদের হুমকি দিচ্ছে তারা নয়, বরং আমিই অপরাধী।”

১৩ http://bomsa.net/

১৪ http://www.thefinancialexpress-bd.com/2016/10/21/50226/The-life-back-home-migrant-women-live

চ. বাক্-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আইনী প্রতিবন্ধকতা

২০১৩ সালে আইসিটি আইনে আনা সংশোধনী

শাহবাগ আন্দোলন শুরুর পাঁচ মাসের মাথায় যখন একজন ব্লগারের হত্যাকাণ্ড ঘটে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করতে বাংলাদেশের সংসদ ২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে বেশ কিছু সংশোধনী আনে যা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। পূর্ববর্তী সরকার ২০০৬ সালে ক্ষমতা ছাড়ার অল্প কিছু সময় আগে এই আইন প্রণয়ন করেছিল।[১৫] সাইবার অপরাধ এবং অনলাইনে দেয়া তথ্য যাচাই বাছাই প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলেও এই আইনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার অনেক উপাদান রয়েছে।

সংশোধিত তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা অনুযায়ী, অনলাইনে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে কিছু প্রকাশ বা প্রচার করা অপরাধ যা "ধর্মীয় অনুভুতিকে আঘাত করে অথবা করতে পারে"। একই রকম অপরাধে দন্ডবিধি অনুযায়ি একজন ব্যক্তিকে তখনই অপরাধী হিসেবে দায়ি করা যাবে যদি "ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করার স্পষ্ট মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ক্ষতিসাধনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য" থাকে।

২০১৩ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে বাক স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্পর্কিত অপরাধের শাস্তি বৃদ্ধি করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্বকারী বেশকিছু বিধানও সংশোধনীর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা নিচে বর্ণনা করা হলো। আইনজীবী এবং মানবাধিকারকর্মী জোতির্ময় বড়ুয়ার মতে, ২০০৬ সালে এই আইন প্রণয়নের পর থেকে ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত এই আইনে মাত্র তিনটি মামলা হয়েছে। কিন্তু ২০১৩ সালের সংশোধনীর পর এ পর্যন্ত লেখক, মানবাধিকারকর্মী এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে এক হাজারেরও বেশি মামলা হয়েছে।

২০১৩ সালের সংশোধনী:

ক) শাস্তিবৃদ্ধি: এই আইনে সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ৫৪, ৫৬ ও ৫৭- যা মানহানি ও 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' সংক্রান্ত অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৪ বছর করা হয়।

খ) নূন্যতম শাস্তির মেয়াদ ৭ বছর;

গ) দশ মিলিয়ন বাংলাদেশী টাকার (আনুমানিক ১১৪,৭৩০ ইউরো) জরিমানার বিধান বজায় রাখা;

ঘ) পুলিশকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার অনুমতি দেয়া;[১৬]

ঙ) যেকোনো লেখা যা "দেশের আইন-শৃঙ্খলা অবস্থার অবনতির সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে"; "রাষ্ট্রের বা ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে এমন" বা "ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করে" তাকে অপরাধের আওতায় নেয়া কিন্তু কি করলে তা অপরাধ বলে গন্য হবে, তা দুর্বোধ্য রয়ে গেছে, বিচারকদের ব্যাখ্যার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান;

চ) বিভিন্নমাত্রার অপরাধের জন্য অভিন্ন শাস্তি প্রদানের ঝুঁকি।[১৭]

১৫ http://www.icnl.org/research/library/files/Bangladesh/comm2006.pdf

১৬ মূল আইন অনুযায়ী কাউকে আটকের আগে বা কারো বিরুদ্ধে মামলা করার আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন ছিল।

১৭ সংশোধনীতে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো থেকে শুরু করে মিথ্যা ও আপত্তিকর তথ্য ও ছবি প্রকাশ বা উস্কানীমূলক মন্তব্য করা এ ধরনের বিভিন্ন মাত্রার অপরাধের জন্য একই ধরনের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

২০১৬: ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট

২০১৬ সালে বাংলাদেশ সংসদ খসড়া ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট আমলে নিতে শুরু করে; যা মন্ত্রিপরিষদ গত আগস্ট মাসে অনুমোদন দেয় এবং এটি এখন জাতীয় সংসদে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।[১৮] এই খসড়া আইনটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২০১৩ সালের ইনফরমেশন এণ্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) আইনের পরবর্তী ধাপ; যেখানে ধারা ৫৫ এবং ৫৭ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। 'মানহানী' এবং 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত'-জনিত অপরাধের শাস্তি সর্বোচ্চ ১৪ বছর থেকে কমিয়ে ২ বছর করা হয়েছে। এই প্রস্তাবিত আইনে সর্বনিম্ন সাজা হচ্ছে দু'মাস এবং দুই লাখ টাকা (আনুমানিক ২৩০০ পাউন্ড)। যাহোক, এই আইনে এমন কিছু সমস্যাজনক ভাষা আছে, যা মানবাধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে।

এই খসড়া আইনে বলা হচ্ছে, কোনো সংগঠন কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে সংগঠনের এমন প্রত্যেকে মালিক, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলে গণ্য হইবে, যদি না প্রমাণ করা যায় যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। যদি তারা এই দু'টি শর্তের কোনোটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা এই অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবেন। এই ধারাটি একটি সমস্যাজনক ধারা, যেহেতু ব্যক্তি পর্যায়ে অপরাধের দায় থেকে মুক্তির ব্যাপারে সহ-অভিযুক্তদের ওপর প্রমাণের ঝুঁকি রয়েছে। এতে শুধু মানবাধিকার বিষয়ে মানবাধিকারকর্মীদের লেখা বা ব্লগিং বিষয়ে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে না, বরং তাদের সহকর্মীর বেলায়ও সে ঝুঁকি রয়েছে; যদিও তারা তাদের কাজ সম্পর্কে লিখুক বা কোনো পোস্ট দিক।

এই খসড়া আইনটি যদি পাস হয়, নিরাপত্তা ঝুঁকির ফলে যারা ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যোগাযোগ করতে গিয়ে মারাত্মক বাধার সম্মুখিন হয়েছেন, সেসব মানবাধিকারকর্মীদের মধ্যে আন্তঃসহযোগিতার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করবে। মানবাধিকার কর্মীরা অভিযোগ করছেন যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক অপরাধের ক্ষেত্রে সাজা কমানোর বিষয়টি ইতিবাচক হলেও সংবেদনশীল ইস্যুতে লেখালেখির কারণে তাদের পুরো সংগঠনের আইনি ঝামেলায় পরার ঝুঁকি রয়েছে।

জবানবন্দি: শ্রম অধিকার কর্মী

সায়দিয়া গুলরুখ, ২০১২ সালে তাজরিন ফ্যাশন গার্মেন্ট কারখানায় আগুনের ঘটনা- যেখানে অন্তত ১১২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছিল এবং ২০১৩ সালে সাভারে রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনা, যেখানে- ১১২৯ জন শ্রমিক নিহত এবং ২৫০০ জন মতো জীবিত উদ্ধার হয়েছিল, সেসব শ্রমিকদের বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য শ্রমিক অধিকার কর্মী হিসেবে পরিচিত। গুলরুখ এসব ঘটনা এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অন্যান্য অধিকার লংঘনের বিষয়ে কয়েক বছর ধরে অনুসন্ধান এবং প্রতিরোধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।[১৯] সম্মিলিত নারীবাদী ব্লগারদের অংশ হিসেবে কারখানার নারী শ্রমিকদের বিষয়েও তিনি লেখালেখি করেছেন। অন্যান্য লেখকেদের ঝুঁকির কথা চিন্তা করে গুলরুখ শ্রম অধিকার সংশ্লিষ্ট বিতর্কিত বিষয়ে তার লেখালেখি বা ব্লগিং হ্রাস করেছেন।

> *"আমি বিভিন্ন আন্দোলন উদ্যোগের হয়ে লেখালেখি করি। আইসিটি আইনের সংশোধনের সময় থেকে এবং যখন তারা (পুলিশ) গণগ্রেফতার শুরু করেছে, তখন থেকে আমি নিজের চেয়েও আমার সহকর্মীদের বিষয়ে বেশি ভীতসন্ত্রস্ত। পুলিশ এমনভাবে আপনাকে আটক করে নিয়ে যাবে, যেখানে আপনার আটকাবস্থা স্বীকার করা হবে না- এমন অবস্থায় আপনার সহকর্মীদের বিপদের মুখে ফেলার ভয়ে কোনো সংগঠনের সদস্য হয়ে লেখা সত্যি খুব কঠিন। এসব আইন শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য আমার লেখালেখির সামর্থ্যকে সীমিত করে দেয়। নতুন ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন এটাকে আরো বাজে করে তুলবে।"*

জবানবন্দি: অভিবাসীদের অধিকার কর্মী

নারী মানবাধিকারকর্মী সুমাইয়া ইসলাম বলেছেন যে, আইসিটি আইনের ২০১৩ সালের সংশোধনীর মধ্যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত শাস্তি বৃদ্ধির বিষয়টি অভিবাসী কর্মীদের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট নীতি পরিবর্তনের জন্য কার্যকরভাবে তার কাজের সামর্থ্যকে

১৮ http://www.thedailystar.net/frontpage/new-law-curb-cybercrime-1274128
১৯ https://thotkata.net/2013/05/18/nine-to-five-feminism-and-thoughts-in-the-wake-of-tazreen-factory-fire-3/

সীমিত করেছে। তিনি বলেছেন যে, ৫৭ ধারায় উল্লিখিত 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার বিরুদ্ধে তার কাজকে প্রভাবিত করেছে।

> *"ব্লগারদের খুনের ঘটনার পর, সরকার মানবাধিকার বিষয়ে কথা বলা প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। কোনো অভিযোগ ছাড়াই যদি তারা আমাকে গ্রেফতার করতে পারে এবং কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অপরাধে আমাকে ১৪ বছর পর্যন্ত জেল দিতে পারে, তাহলে উপসাগরীয় এলাকা- যা কিনা এই ধর্মের পিতৃভূমি, সেখানে অভিবাসী শ্রমিকদের পক্ষে আমার পক্ষে কি জাতীয় সমর্থন আদায় করা সম্ভব?"*

সুমাইয়া ইসলাম জাতীয় টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং টিভি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১৫ সালে বিবিসি বাংলায় মন্ত্রীর অবস্থানের বিপক্ষে কথা বলার পর তিনি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর কাছ থেকে ফোন পেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ওই শো'তে করা তার বক্তব্যের জন্য ওই ফোন কলে মন্ত্রী তার বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, পরবর্তী পাবলিক ইন্টাভিউতে সুমাইয়া যদি আগের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন তাহলে তিনি (মন্ত্রী) অভিযোগ আনবেন না।

> *"মন্ত্রী আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ডেকেছেন এবং আমার সংগঠন বন্ধ করে দেওয়া অথবা আমার বিরুদ্ধে মামলা করার আনার হুমকি দিয়ে তিনি আমাকে অধিকার বিষয়ক কাজ বন্ধ করতে বলেছেন। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে পাঠানো আমার কাজের জন্য একটি বড় সাফল্য কিন্তু এগুলো এক ধরনের হুমকি যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন, যখন সংবাদ মাধ্যম আমার সাক্ষৎকার নিতে আসে,তখন থেকে আমি সময় গুনতে থাকি যতক্ষণ না রাষ্ট্র আমার সংগঠনকে টার্গেট করে বা আমার সহকর্মীদের হুমকি দেয়। আমি এটাকে খুবই অপছন্দ করি। আপনি যদি স্বাধনতা এবং অধিকারের জন্য কাজ করেন, আপনার উচিত সমাজে একটা শক্ত অবস্থানে দাড়ানো।"*

ছ. সুরক্ষা প্রদানে অস্বীকৃতি

মানবাধিকারকর্মীরা *ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স*কে অভিযোগ করে বলেছেন যে, পুলিশ নিয়মিতভাবেই সুরক্ষার দেওয়ার ব্যাপারে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে অথবা অবজ্ঞা করেছে। খুন হওয়া মানবাধিকারকর্মীদের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন যে, খুন হওয়ার কয়েক মাস আগেই মানবাধিকারকর্মীরা পুলিশকে সুরক্ষার জন্য অনুরোধ করেছেন অথবা ধারাবাহিক হত্যা হুমকির পর ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। অন্তত দু'জনকে পুলিশ 'দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন'। মানবাধিকারকর্মী, যারা এখনো দেশে কাজ করছেন তারা জানাচ্ছেন যে, যখন তারা থানায় মামলা করতে যান, বা হুমকির ঘটনা বা উত্যক্ত করার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যান, তখন থানায় অপমান বা যৌন-মন্তব্যের শিকার হন। বিভিন্ন মানবাধিকার ইস্যুতে কাজ করছেন এমন কর্মীরা অভিযোগ করছেন যে, শারিরীক এবং মৌখিক হুমকির বিষয়ে যখন তারা সংশ্লিষ্ট এলাকার থানায় অভিযোগ করতে যান, তখন পুলিশ তাদের অভিযোগ নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

> *"২০১৩ সালে যখন আমি মৃত্যুহুমকি পেতে শুরু করি, তখন সুরক্ষা চাওয়ার বিষয়টি আমি বিবেচনা করেছিলাম। কিন্তু আমি পুলিশকে এড়িয়ে চলি, কারণ তারা অন্যদের সুরক্ষা দেয়নি। এছাড়া অন্তত ১০টি ঘটনা আছে, যেসব কর্মী সুরক্ষা চেয়েছে, তাদের বিষয়টি নামসহ ঢাকার খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে– 'মানবাধিকার কর্মী গতকাল পুলিশের কাছে সুরক্ষা চেয়েছে! কখনো কখনো এমনকি তাদের ঠিকানাও ছাপানো হয়েছে। আমি পুলিশকে যা বলেছি, সংবাদ মাধ্যম হুবহু তা ছাপাচ্ছে, যা আমাকে আরো ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। সুতরাং আমি কখনো হুমকির বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে চাই না।" -জনৈক মানবাধিকারকর্মী, ঢাকা*

অনেক মানবাধিকারকর্মী এবং খুন হওয়া মানবাধিকার কর্মীদের পরিবারের লোকজন *ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স*-এর কাছে অভিযোগ করেছেন যে, তাদের 'সাধারণ ডায়রি' গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে এক থানা তাদের অন্য থানায় যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা সুরক্ষা চেয়ে অন্য পুলিশ স্টেশনে গেছেন, তারা কয়েক জায়গায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। *ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স* অবশ্য মানবাধিকারকর্মীদের সাথে কথা বলেছেন, যারা ২০১৩ সাল থেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন; যাদের অনেকে মানবাধিকার বিষয়ে লেখালেখির জন্য অনলাইনে হুমকি পাওয়ায় পুলিশকে জানানোর পর পুলিশ তাদের বাড়িতে এসেছে, লেখা এবং বই বাজেয়াপ্ত করেছে এবং হুমকি বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

অন্তত পাঁচটি ঘটনায়, হুমকির শিকার মানবাধিকারকর্মীরা তাদের বিরুদ্ধে আসা হুমকির বিষয় পুলিশকে জানিয়েছেন, তার একদিনের মাথায় ওই হুমকির বিষয়টি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। অপ্রত্যাশিত মনোযোগ আবার তাদের বা তাদের পরিবারের জন্য হুমকি বয়ে এনেছে। ঢাকায় কর্মরত মানবাধিকার কর্মীরা অভিযোগ করছেন যে, পুলিশ এবং অপরাধ বিষয়ক সংবাদকর্মীদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির গোপনীয়তার প্রতি পুলিশের শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতি রয়েছে; যা হুমকি পাওয়া মানবাধিকার কর্মীদের পুলিশকে জানানোর ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করছে।

জবানবন্দি: অভিজিত রায়ের পরিবার

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, হত্যার ছয় মাস আগে, মানবাধিকারকর্মী অভিজিৎ রায় ফেসবুকে পাওয়া মৃত্যু হুমকির ছবি তার 'মুক্তমনা' ব্লগে প্রকাশ করেন।[২০] স্থানীয় উগ্রবাদী দলের সাথে সম্পৃক্ত বলে খ্যাত বাংলাদেশী ফারাবী শফিউর রহমান লিখেছিল "অভিজিৎ রায় আমেরিকায় বাস করে। যে কোনো মুহূর্তে তাকে হত্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু যখন সে দেশে ফিরবে, তাকে হত্যা করা হবে।" শফিউর রহমানের পোস্টকৃত বহু মৃত্যু হুমকির মধ্যে এটি একটি হুমকি ছিল।

২০ http://enblog.mukto-mona.com/2014/09/24/from-farabi-to-isis-the-virus-of-faith-is-indeed-real/#post/0

অভিজিৎ রায়ের স্ত্রী, বন্যা আহমেদ, যিনি হত্যাকাণ্ডের রাতে হামলার শিকার হয়েছিলেন, ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্সকে জানান– তার স্বামীর মৃত্যুর আগে পুলিশকে একাধিক মৃত্যু হুমকির কথা জানানো হয়েছিল কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর ব্লগ পোস্টে অভিজিৎ রায় প্রাপ্ত মৃত্যু হুমকির কথা নিজেই প্রকাশ করে লিখেছিলেন:

> *এখানেই গল্পের শেষ নয়। ফারাবী রকমারি ডট কমে (বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন বইয়ের দোকান) ও মৃত্যু হুমকি লিখেছিল এবং উক্ত সাইটকে আমার বই বিক্রি বন্ধ করতে নির্দেশ দেয়। [ফারাবী] রকমারি'র অফিসের ঠিকানা উল্লেখ করে এবং তার উগ্রবাদী বন্ধুদের উক্ত অফিসের নিকটবর্তী এলাকা আক্রমণ করতে বলে। সে রকমারি ডট কম এর মালিক (মাহমুদুল হাসান সোহাগ) কে হুমকি দেয়, যদি সে কথা না শোনে তাহলে আহমেদ রাজীব হায়দারের মতো পরিণতি হবে বলে হুমকি দেয়। ফলাফল স্বরূপ, রকমারি তাদের তালিকা থেকে আমার বই বাতিল করে দেয়। এ সংবাদ বেশ হৈ চৈ ফেলে দেয় এবং এ বিষয়টি জাতীয় ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের নজরে আসে... যাই হোক, সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ফারাবী গ্রেফতার হয়নি।*[২১]

অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ডের চারদিন পরে, কর্তৃপক্ষ মার্চ ২০১৫ সালে হত্যার সাথে সম্পৃক্ততার দায়ের ফারাবী শফিউর রহমানের গ্রেফতারের ঘোষণা দেয়।[২২] যাই হোক, মানবাধিকারকর্মীর হত্যাকাণ্ডের পূর্বে বহুসংখ্যক মৃত্যু হুমকির তদন্তে ব্যর্থতা বাংলাদেশের নিয়মিত প্রক্রিয়া হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

জবানবন্দি: নিলয় নীলের পরিবার

হত্যার শিকার ব্লগার ও মানবাধিকারকর্মী নিলয় নীলের স্ত্রী ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্সকে জানায়, ২০১৫ সালে তার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের কয়েকমাস পূর্বে পুলিশের নিরাপত্তা চাওয়া সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আশামনির মতে, হত্যার ছয় মাস আগ থেকে ফেসবুক এবং তার ব্লগের মন্তব্য অংশে মৃত্যুর হুমকি পেয়েছিল।২০১৪ সালের মে মাসে অপর একজন ব্লগারের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পর নীল লক্ষ্য করে যে, তাকে প্রতিদিন চক্রাকারে একই ব্যক্তি, গাড়ি ও মোটর বাইক অনুসরণ করছে। নীল মৃত্যুহুমকি, নজরদারি এবং ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা সম্পর্কে পুলিশে অভিযোগ করতে গিয়েছিল। আশামনির বক্তব্য অনুযায়ী, পুলিশ জিডি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়; বলে– তাদের কিছু করার নেই' কারণ "দেশের এমন পরিস্থিতিতে ব্লগারদের জন্য কিছু করা যাবে না।" অন্য এক জন পুলিশ কর্মকর্তা নীলকে বলে: "যদি আপনি অনিরাপদ বোধ করেন, তাহলে দেশ ছেড়ে চলে যান।"

> *নিলয় তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে এমন বহু মৃত্যু হুমকি পেয়েছিল 'আমরা আসছি, তোমাকে কুপিয়ে হত্যা করবো' বা 'আমরা আসছি তোকে কোপাতে'। মানবাধিকারকর্মী এবং ব্লগার অনন্ত বিজয়ের হত্যার পরে, নিলয় উক্ত ঘটনার প্রতিবাদ কর্মসূচি মানববন্ধনে অংশ নিয়েছিলেন। ঐ রাতেই তাকে একদল যুবক বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করে। নীল তার বাড়ি ফেরার পথ বদলে ফেলে এবং ছোট এক রাস্তার পাশে লুকিয়ে থাকে। পরে সে রিকশা নিয়ে বাড়ি ফেরে। তারপর থেকে সে ফেসবুকে লেখালেখি একটু কমিয়ে দেয় এবং তার ছবিসমূহ সরিয়ে ফেলে। নীল ফেসবুকে তার অবস্থান সংক্রান্ত সেটিং বদলে ফেলে যেখানে সে উল্লেখ করে যে সে বাংলাদেশে নয় ভারতে আছে। পরবর্তী সময়ে নিলয় কে পুনরায় তার বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করা হয় এবং পরদিন সকালে সে তার নিজের সম্পর্কে ও তাকে কিভাবে অনুসরণ করা হয়– এ সমস্ত তথ্য লিখিতভাবে গুছিয়ে নেয়। তার পরপরই সে খিলগাঁও এলাকার থানায় যায় উক্ত লিখিত তথ্যসহ রিপোর্ট দায়ের করতে।*
>
> *এক পুলিশ কর্মকর্তা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি একজন ব্লগার? আমরা ব্লগারদের নিরাপত্তা দিতে পারি না। আপনার বিদেশে চলে যাওয়া উচিত।' অপর এক পুলিশ কর্মকর্তা জানায়, আপনাকে শাহজাহানপুর এলাকায় অনুসরণ করা হয়েছিল, তাই আপনাকে উক্ত এলাকা সংশ্লিষ্ট থানায় যেতে হবে।' যদিও আমাদের জানা ছিল যে যেকোনো এলাকার পুলিশ ঘটনার অভিযোগ গ্রহণ করতে পারে, নিলয় দ্বিতীয় পুলিশ স্টেশনেও যায়। সেখানেও তাকে বিদেশে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়।*
>
> *নিলয় বাংলাদেশ ত্যাগ করতে চায়নি। তাই এরপর একের পর এক মৃত্যু হুমকি পাবার পরও আর পুলিশকে কিছু জানায়নি। তার কয়েক মাস পরে, হত্যাকারীরা আমাদের বাড়িতে আসে।"*

২১ http://enblog.mukto-mona.com/2014/09/24/from-farabi-to-isis-the-virus-of-faith-is-indeed-real/

২২ https://www.theguardian.com/world/2015/mar/02/bangladesh-authorities-arrest-man-atheist-bloggers-murder-avijitroy#img-1

জবানবন্দি: শ্রম অধিকারকর্মী

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া বা ধ্বসে পড়া গার্মেন্টস কারখানার ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের প্রতি ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলাকালে সায়দিয়া গুলরুখ হুমকি, হয়রানি এবং শারীরিক হামলার শিকার হন। গুলরুখ ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্সকে জানান, প্রতিবাদ কর্মসূচিতে তার ওপর শারীরিক হামলার পরে তিনি ঢাকার ধানমন্ডি এলাকার স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে, উক্ত থানার পুলিশ কর্মকর্তাগণ গুলরুখের লিখিত জবানবন্দি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। গুলরুখ কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তার অবমাননাকর ও যৌন মন্তব্যের সম্মুখীন হন। একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা তার অভিযোগ নিতে অনীহা বা অপরাগতা প্রকাশ করে।

গুলরুখ জানান, পুলিশ কর্মকর্তাগণ তার অভিযোগে উল্লেখকৃত হামলার ঘটনাসমূহের মধ্যে একটি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট থানায় যেতে নির্দেশ দেয়। গুলরুখের মতে, পুলিশ কর্মকর্তাগণ তার উক্ত এলাকায় যাওয়ার ঝুঁকির কথা জেনেই তাকে এমন নির্দেশ দেয়। তিনি এবং অন্যান্য কর্মীরা ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্সকে জানান, তাদের বিশ্বাস যে কারখানার মালিককে তারা আইনের আওতায় আনার জন্য কাজ করছেন, তার সঙ্গে পুলিশের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

গুলরুখ আরো জানান, ২০১৩ সালে এক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কারখানা মালিকের নিরাপত্তাকর্মীরা মিছিলে অংশগ্রহণকারী মানবাধিকারকর্মীদের চিহ্নিত করে পুলিশেকে অবহিত করে। তারপর পুলিশ গুলরুখ এবং অন্যান্য কর্মীদের ওপর শারীরিক হামলা চালায় এবং তাদের গ্রেফতার করে।

> “আমরা সর্বদা সঙ্গী নিয়ে চলাফেরা করি, দলবদ্ধভাবে বাড়ি ফিরি। কিন্তু এক হামলার পর আমাদের বন্ধুরা এবং আইনজীবী আমাদের বলে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে, যদি এর চেয়ে মারাত্মক কিছু ঘটে তখন যেন আমাদের দোষারোপ না করা হয় যে আমরা সাহায্য বা নিরাপত্তা চাইনি। কারণ পুলিশ মানবাধিকারকর্মীদের সাথে প্রায়ই এমন করে থাকে। তাই আমরা লিখিত বক্তব্যসহ থানায় গেলাম এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে জানালাম। উক্ত থানা নারীর প্রতি সম্মানজনক বা অনুকূল ছিল না। এরকম ঘটনা আপনাকে আহত ও ভঙ্গুর করে তোলে। পুলিশ কর্মকর্তারা আমার বক্তব্যের দিকে তাকায়নি, আমাদের দিকে তাকিয়ে যখন বুঝতে পারলো যে এটা শ্রমিকের অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগ এবং তারা সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলে, ‘আমরা এখানে এটা নিবো না, চলে যান’। পুলিশ আমাদের সেই এলাকায় যেতে বলেছে যেখানে আমাদের ওপর হামলা হয়। যখন আমরা বললাম যে আমরা পুনরায় আক্রমণের শিকার হতে পারি যদি আমরা সেখানে যাই কিন্তু পুলিশের পীড়াপীড়িতে আমাদের সেই এলাকায় যেতে হয়। পরে আমরা জানতে পারি যে আইন অনুযায়ী যে কোনো থানা আপনার বক্তব্য বা অভিযোগ গ্রহণ করতে পারে।”

জ. মানবাধিকারকর্মীদের ওপর প্রভাব

মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলার বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রভাব বাংলাদেশের অন্তত ১০টি ভিন্ন ভিন্ন মানবাধিকার আন্দোলনের ওপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। শ্রমিক, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, লৈঙ্গিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক এবং গার্মেন্টস শ্রমিকদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করা মানবাধিকারকর্মীরা সকলে তাদের কাজ বন্ধ বা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ার জন্য নিরাপত্তা, হত্যা, ক্ষতিগ্রস্তকে দোষারোপ ও বাকস্বাধীনতায় আইনগত বাধা নিষেধের মাধ্যমে সমাজে তৈরি ভয় ও দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে দায়ী করেছে।

কয়েকডজন মানবাধিকারকর্মী দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছেন। যারা দেশ ছাড়তে চায় না বা সেরকম সক্ষমতা নেই বিশেষ করে যাদের নাম "হিট লিস্টে" প্রকাশিত হয়নি তারা মানবাধিকার, নারী অধিকার, ধর্মের স্বাধীনতা, আদিবাসী জনগোষ্ঠীয় অধিকার ও যৌনতা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ এবং লেখালেখি কমিয়ে দিয়েছেন বলে জানা যায়। যতজন মানবাধিকারকর্মীর সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে তারা সকলেই শারীরিক হামলা ও আইনগত হয়রানি এবং ২০১৩ সাল থেকে বৃদ্ধি পাওয়া স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপের কথা উল্লেখ করেন।

১. নির্বাসন

গত কয়েক বছরে দেশে মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য হারে বিস্তারের কারণে জরুরি ভিত্তিতে মানবাধিকার কর্মীদের দেশত্যাগ ও বৃদ্ধি পায়। ফ্রন্ট লাইন ডিফেন্ডার্স ও এর শরীক সংস্থাসমূহ অন্তত পক্ষে ২৫ জন মানবাধিকারকর্মীর বাধ্য হয়ে দেশ থেকে স্থানান্তরের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেছে, এর পিছনে কারণ হচ্ছে 'হিটলিস্টে' নাম প্রকাশ, সরাসরি মৃত্যু হুমকি পাওয়া এবং শারীরিক হামলার শিকার হওয়ার পরে নিরাপত্তা প্রদানে পুলিশের অস্বীকৃতি। পরবর্তী সময়ে দেশ থেকে নির্বাসিত মানবাধিকারকর্মীদের প্রবাসে থাকাকালীন সময়ে লেখালেখি ও বাক-স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা সভা/সেমিনার আয়োজন শুরু হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থানরত পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা হীনতার আশঙ্কায় তারা মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজ কমিয়ে দেয়।

২. স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপ:

ঢাকায় ডজনের অধিক মানবাধিকারকর্মীদের সাথে ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স এর কথোপকথনের পর জানা যায়, সবাই তাদের লেখালেখির হার কমে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই অন্তত পক্ষে একটি করে ঘটনার উদাহরণ দিলেন– যখন তারা মানবাধিকার ইস্যুতে লেখার কথা ভাবছিলেন বা লিখেছিলেন, পরে তারা শারীরিক হামলার ভয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে এ ধরনের লেখালেখি প্রকাশ করবেন না। অর্ধেকের বেশি মানবাধিকারকর্মীর মতে, তারা মানবাধিকার বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে পোস্টিং বন্ধ করে দিয়েছেন।

- **ভূমি ও আবহাওয়া বিষয়ক অধিকারকর্মীরা** যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কাজ করেন তারা অমুসলিম আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে লেখালেখি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্টিং কমিয়ে দিয়েছেন।
- জুলহাজ মান্নান হত্যার পরে **সমকামী অধিকারকর্মীরা** তাদের যুগান্তকারী ম্যাগাজিন 'রূপবান'-এ লেখা ও প্রকাশনা পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন।[২৩]
- **শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্মরত মানবাধিকারকর্মী** এবং অধ্যাপকরা তাদের ছাত্রদের জন্য আয়োজিত মানবাধিকার আলোচনা ও লেকচারে স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপ করছেন বলে জানা যায়।
- **শ্রম অধিকারকর্মীরা** নানাবিধ আউটলেটে লেখালেখি কমিয়েছেন, এমনকি বাংলাদেশের শ্রমিক অধিকার ও নারী অধিকার উভয় ক্ষেত্রে এক সাথে আলোকপাত করে এমন একটি নারীবাদী ব্লগেও লেখালেখি খুব বেশি হচ্ছে না; কারণ তাদের ভয় যে তারা একই প্লাটফর্মের অন্যান্য লেখকদের ঝুঁকির সম্মুখীন করছেন।[২৪]

২৩ https://twitter.com/roopbaan
২৪ https://thotkata.net/

- **নারী অধিকারকর্মীরা** জানান, বেশ কিছু বিষয়ে "অনেকটা হঠাৎ করেই লেখালেখি করতে পারছেন না", জেন্ডার সহিংসতাসহ নারী অধিকারকর্মীর এক ধরনের শঙ্কা বোধ করেন যে, তাদের ছেলে সন্তানরা যেন আবার তাদের পরিবর্তে টার্গেট হয়ে যায়; এ শঙ্কার পিছনে যুক্তি হলো পূর্বে যারা হত্যার শিকার হয়েছেন তারা সবাই পুরুষ ছিলেন।
- **আদিবাসী গোষ্ঠীর অধিকার** নিয়ে দেশের জাতীয় দৈনিকে প্রথম কলামে লেখা মানবাধিকারকর্মীর লেখালেখি নিয়মিত মাসিক ভিত্তিতে না হয়ে এক পর্যায়ে বছরে কয়েকবার লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; কারণ হিসেবে তিনি হামলা, বেড়ে যাওয়া সেন্সরশীপ এবং প্রকাশের আগে তার লেখাতে কাটছাঁট প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন।
- **দেশে অবস্থানরত ব্লগাররা** গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা ইত্যাদি বিষয়ে লেখা বন্ধ করে অতিসংবেদনশীল এমন কবিতা লেখাতেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।
- **অভিবাসী অধিকারকর্মীরা** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার বিষয়ে লেখা কমিয়ে দিয়েছেন বলে জানান কারণ তাদের ভয় যে তাদের উপসাগরীয় দেশে বসবাসরত অভিবাসী শ্রমিকদের পক্ষে তাদের সমর্থনকে 'ইসলাম বিরোধী' কর্মকাণ্ড বলে হামলা ও হত্যার ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে।
- **নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে যে মানবাধিকারকর্মীরা** সক্রিয় ছিলেন তারা 'বিচারবহির্ভূত হত্যা' বিষয়ে তাদের প্রকাশনা কমিয়ে দিয়েছেন বলে জানান।

খুশী কবির, নারী ও আদিবাসী অধিকারকর্মী, ঢাকা। ছবি: ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স

জবানবন্দি: আদিবাসী অধিকারকর্মী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভূমি ও আদিবাসী অধিকারকর্মী হিসেবে পরিচিত একজন মানবাধিকারকর্মী ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্সকে জানান, দেশে মানবাধিকারকর্মীদের টার্গেট করা ও তাদের ওপর বিভিন্ন সময়ে হামলার ঘটনা তার আন্দোলন ও কাজকে নানাভাবে সীমিত করেছে। উক্ত মানবাধিকারকর্মী রাজধানী ঢাকা ও প্রবাসে উভয় স্থান থেকে কাজ করেছেন, কিন্তু তিনি ২০১৩ সালে হামলার দ্রুত বিস্তার ও সরকারের হতাশাজনক ভূমিকার কারণে বর্তমানে তার প্রকাশ্যে লেখালেখি এবং মানবাধিকার ইস্যু/বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্টিং দেশের বাইরে অবস্থানরত সময়ে করে থাকেন, যাতে তার ওপর হামলা বা প্রতিশোধমূলক আক্রমণ না ঘটে। তার মতে, ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে লিখেছে এই অভিযোগ এনে তাদেরকে টার্গেট করে এ ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছে, আর এ কারণেই অমুসলিম আদিবাসী মানুষজনের অধিকারের পক্ষে তার কাজের কারণে তিনি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়তে পারেন। এ নারী মানবাধিকার কর্মী আরো জানান, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন লেখালেখির ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে যে হত্যাকারীদের নিন্দা না করে সরকার হত্যার শিকার মানবাধিকারকর্মীদের (যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন লেখালেখি করেছেন) বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দোষারোপ করার প্রবণতা দেখে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে যদি তিনি তার মৃত্যুহুমকির কথা বলেন, তিনি কোনো ধরনের সুরক্ষার পাবেন না। ফলাফলস্বরূপ, তিনি দেশে অবস্থানরত সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন এবং মানবাধিকার বিষয়ে লেখালেখি থেকে নিজেকে বিরত রাখেন।

> “হত্যাকাণ্ডগুলো যখন প্রথম শুরু হয় তখন সরকারের তরফ থেকে প্রতিক্রিয়া ছিল মর্মান্তিক। এরপর সরকার হত্যার শিকার ব্যক্তিদেরই দোষারোপ করা শুরু করলো। হত্যাকারীরা এ থেকে সরকারের অবস্থান বুঝে ফেলে। যখন ধর্মীয় সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ, সমকামী অধিকারকর্মী এবং লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ে লেখালেখিতে সক্রিয় মানবাধিকারকর্মীরা আক্রমণের শিকার হতে থাকেন, তখন আমরা জানতাম যে, এটা শুধু সময়ের ব্যাপার আমরা যারা অমুসলিমদের নিয়ে কাজ করি, তারাও একদিন আক্রমণের শিকার হবো।”

জবানবন্দি: আদিবাসী অধিকারকর্মী

সঞ্জীব দ্রং একজন আদিবাসী অধিকারকর্মী এবং ঢাকায় থাকেন। তিনি বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম-এর সাধারণ সম্পাদক এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর সহিংসতা বিষয়ে কলাম লিখছেন। তিনি প্রথম আদিবাসী অধিকারকর্মী যিনি নিয়মিত জাতীয় পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেন এবং বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি ও অস্তিত্ব সংকট বিষয়কে বিস্তারিতভাবে সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরেন।[২৫] ২০১৩ সালের আইসিটি আইনের সংশোধনীর পর থেকে সঞ্জীব দ্রং ক্রমাগতভাবে স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপের শিকার। তার কাছ থেকে জানা যায়, ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে একজন সম্পাদক তার কলামে আলোচনার বিষয়বস্তুতে এমন পরিবর্তন আনে- মানবাধিকার বিষয়ক শব্দ সরিয়ে দেয়– তার মতে, গত দশ বছরে এ ধরনের অভিজ্ঞতা তার প্রথম। সঞ্জীব দ্রং আরো জানান, বাংলাদেশে “আদিবাসী” শব্দটি বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে এমন বলে বহুদিন ধরে প্রচলিত, কিন্তু মানবাধিকারকর্মীদের ওপর নতুন আইনি নিষেধাজ্ঞা তাদের আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ভূমি ও পরিবেশ সংক্রান্ত অধিকার নিয়ে কাজের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করছে। ফলাফলস্বরূপ, সঞ্জীব দ্রং ও অন্যান্য আদিবাসী অধিকারকর্মী সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং স্বতন্ত্র ব্লগে পোস্টিং কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

জবানবন্দি: মানবাধিকারকর্মী

শান্তনু মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপক। মানবাধিকার, রাজনৈতিক সহিংসতা ও গণতন্ত্র সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান ছাড়াও তিনি বিভিন্ন কর্মশালা, প্রদর্শনী এবং সেমিনার আয়োজন করে থাকেন– তার ছাত্র ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য দেশের মানবাধিকার সংগ্রাম ও গণতন্ত্র আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য। বাংলাদেশের তরুণ সমাজের সাথে কথা বলার জন্য তিনি বিভিন্ন দেশের মানবাধিকারকর্মীদের নিয়মিত নিয়ে আসেন। শান্তনু মজুমদার সরকারের দুর্নীতি, মৃত্যুদণ্ড নিয়ে কথা বলেছেন। শান্তনু মজুমদার ব্যাপকভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করেছেন ও ঢাকার সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে তাদের সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বা ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তার কোর্স সমন্বয়ের জন্য তিনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করেছেন।

২৫ http://opinion.bdnews24.com/2011/08/04/adivasi-land-rights/

২০১৩ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে মানবাধিকারকর্মী এবং ধর্মীয় উগ্রবাদের সমালোচনাকারীদের ওপর হামলার পর শান্তনু মজুমদার তার পেশাগত কাজে ও আন্দোলনে মানবাধিকার সম্পর্কিত কাজ কমিয়ে দেন। তিনি 'ইসলাম বিরোধী বক্তা' হিসেবে ফোনকল, ফেইসবুক পোস্ট ও চিঠির মাধ্যমে বিভিন্ন হুমকি পান। সরকার যখন হত্যার শিকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্লগারদের "ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার জন্য দোষারূপ করতে শুরু করে, একই সময় থেকে অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার তার 'মানবাধিকার' বিষয়ে কোর্স বিষয়ে ছাত্রদের অভিযোগ পেতে শুরু করেন। বর্তমানে তিনি বলেন, তার মানবাধিকার গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সহিংসতা বিষয়ক বক্তৃতায় তিনি নিজেকে স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপের আওতায় রেখেছেন।

> *"মানবাধিকারকর্মীদের হত্যার সবচেয়ে নেতিবাচক দিক আতংক নয়, বরং স্বআরোপিত সেন্সরশীপ। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিক– আমরা সকলে। গতকাল আমি দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র বিষয়ে ক্লাস নেয়ার সময় আমার ছাত্রদের বলেছিলাম, বর্তমানে আমি আমাকে সেন্সর করছি। আমি বাক-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার জীবনের ভয় আছে।*

৩. মানবাধিকারকর্মীদের নেটওয়ার্কে ভাঙ্গন

মানবাধিকারকর্মীদের হত্যা ও সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপহীনতার পর প্রায় সব ক্ষেত্রের মানবাধিকারকর্মীদের আন্দোলন, নেটওয়ার্কে আংশিক বা পূর্ণভাবে ভাঙ্গন ধরে। বিশেষ করে, সমকামী, শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করা মানবাধিকারকর্মীরা তাদের সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ কমানো বা বিচ্ছিন্ন করা শুরু করে। যারা হত্যার শিকার মানবাধিকারকর্মীদের সাথে বা একই ধরনের বিষয়সমূহে কাজ করতেন, তারা এখন 'সমাজচ্যুত বা বহিরাগত' এমন ধরনের আচরণের সম্মুখীন হচ্ছেন।

মানবাধিকারকর্মীরা যারা এক সময় সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভালো অবস্থানে ছিলেন তারাই এখন সমাজে কিছু বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে পরিচিত হচ্ছেন। মানবাধিকারকর্মীরা যারা জবানবন্দি দিয়েছেন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের ভাঙ্গনের কথা উল্লেখ করেছেন;

মানবাধিকার নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে: ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে জুলহাজ মান্নানের মৃত্যুর পর মানবাধিকার কর্মীরা তাদের নেটওয়ার্ক বা সংগঠনসমূহের ভাঙ্গনের ভয়াবহ রূপের কথা উল্লেখ করেন। হামলার পর থেকে এসব বিষয়ে সক্রিয় প্রায় ৪০ জন কর্মী তাদের ফেসবুক প্রোফাইল বাতিল করে এবং ফোন নম্বর পরিবর্তন করে ফেলে; এভাবে কাজের অঙ্গনের মানুষদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মানবাধিকারকর্মীদের দেয়া তথ্য মতে, এর কারণে প্রাক্তন সহকর্মী বা বন্ধুকে পাওয়া 'কঠিন, সাধারণত অসম্ভব' হয়ে পড়ে, এমনকি সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাদের উপস্থিতি দেখা যায়নি। বেশ কয়েক বছর ধরে, বিশ থেকে ত্রিশ জনের একটিদল সাপ্তাহিকভাবে জুলহাজ মান্নানের বাসস্থানে একত্রিত হতো এবং সামাজিক কর্মসূচি ও পরিকল্পনা তৈরি হতো সমকামী অধিকার বিষয়ে। এপ্রিল ২০১৬ এর পর থেকে উক্ত দলটি আর সে স্থানে একত্রিত হয়নি বা কোনো আলোচনা বা কাজ ও আর এগোয়নি। মানবাধিকারকর্মীরা যারা নীরবে সমকামী অধিকার এর উন্নয়নে কাজ করতে উৎসাহিত ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমকামী অধিকার বিষয়ক ম্যাগাজিন 'রূপবান' এর ইংরেজিতে অনুবাদের কাজ করছে বা কাজের ক্ষেত্র অধিকার নিয়ে অ্যাডভোকেসির বদলে 'স্বাস্থ্য সেবা বা স্বাস্থ্য অধিকার" এর দিকে পরিবর্তন করেছে।

এমনকি তারা ছোট পরিসরে দেখা সাক্ষাতের জন্যও সহকর্মীদের এবং বন্ধুদের রাজি করাতে সক্ষম হননি। একজন মানবাধিকারকর্মী যিনি স্বাস্থ্য সেবা ও আইনগত সেবা নিয়ে কাজ করেন জানান– এপ্রিল ২০১৬ ও জুলহাজ মান্নানের হত্যা পরবর্তী অবস্থা নিয়ে 'আমরা যাদের সাথে কাজ করতাম, তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে'। তিনি ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্সকে জানান দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ 'রূপবান' ও 'বয়েজ অব বাংলাদেশ' যা কিনা সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করতো তারা 'গা ঢাকা দিয়েছে'। প্রত্যেক দলের সাথে সম্পৃক্ত মানবাধিকারকর্মীরা একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, বিশেষ করে দেশের সমকামী গোত্রের মানুষজনের সাথে।

মানবাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে: হত্যা ও দায়হীনতার কারণে সৃষ্ট ভীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা অধিকার কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। এ শংকার কারণে বিভিন্ন আন্দোলনের ইস্যুতে কর্মীদের মধ্যে সেতুবন্ধনের ও সহমর্মিতা তৈরিতে যারা কাজ করতো তারা পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যেমন: আদিবাসী অধিকারকর্মী ও সমকামী অধিকারকর্মীদের সম্পর্কও ভঙ্গুর হয়ে গিয়েছিল। একজন আদিবাসী অধিকারকর্মী যিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তার কাজের জন্য পরিচিত ছিলেন, তিনি জানান, "সকল সমকামী অধিকারকর্মী অদৃশ্য অবস্থায়। আমি জানি না তারা কোথায় আছে– এবং আমি জানতেও চাই না।"

এ অবস্থায় স্থানীয়ভাবে কাজ করা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও মানবাধিকারকর্মীদের মাঝে যোগাযোগ এবং সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঢাকায় কর্মরত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের এক কর্মী ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্সকে জানায়, মানবাধিকারকর্মীদের প্রকাশ্যে কাজের ইচ্ছার অভাবে 'সমকামী অধিকার কর্মীদের হত্যার পূর্ববর্তী সময়ের মতো সাহায্য সহযোগিতা করা প্রায় সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

জবানবন্দি: অভিবাসী অধিকারকর্মী

অভিবাসী অধিকারকর্মী সুমাইয়া ইসলাম বেসরকারী সংস্থা, মানবাধিকারকর্মী ও গবেষকদের যাদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানেন না, তাদের সাথে নেটওয়ার্কিং বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ তার সংগঠন মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসরত মানবাধিকারকর্মীদের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল; তিনি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলাফল হিসেবে কম যোগাযোগের কারণে নিজেকে ততখানি সম্পৃক্ত অনুভব করতে পারেন না, নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয় তার।[২৬]

> *বাংলাদেশী, মুসলিম নাম সম্পন্ন একজন ব্যক্তি, যিনি লন্ডনে বসবাসরত এবং সৌদি আরবের অভিবাসী নারী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন বিষয়ে গবেষণারত, তার কাছ থেকে আমি একটি অনুরোধ পেয়েছিলাম। তিন বছর আগে হলে, আমি অবিলম্বে তা গ্রহণ করতাম এবং আমার কাছে যা তথ্য আছে সব তাদের পাঠাতাম– সৌদি আরবে গৃহকর্মীদের ক্ষেত্রে সহিংসতার বিষয় যেন গুরুত্ব পায় এবং আমার কাজ হচ্ছে তা প্রচার করা। কিন্তু আমরা জানি যে জুলহাজ এবং অন্যান্য কর্মীরা হত্যার পূর্বে বেশকিছু ফেসবুকে বন্ধু হওয়ার অনুরোধ পেয়েছিল যাদের প্রোফাইল ছবিতে মুখে দাঁড়ি আছে এমন চেহারার পুরুষ ছিল। তাই আমি এ অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করি। আমি এখন অজানা সব মানুষজনকে এড়িয়ে চলি। এটি নিরাপদ হতে পারে, কিন্তু ভয়, শঙ্কা আমাদের অধিকার সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য ভালো নয়। এখন আমি কারো সাথে তথ্য আদান-প্রদান করি না– এর অর্থ হচ্ছে অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সাহায্য করতে পারে এমন গবেষকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না।*

৪. মানবাধিকারকর্মীদের মাঝে বিশ্বাস ও সম্পৃক্ততার অভাব

মানবাধিকারকর্মীদের মতে, হত্যাকাণ্ডের কঠিনতম প্রতিক্রিয়া ছিল নিজেদের মাঝে বিশ্বাসে ফাটল ধরা– বিশেষ করে, মানবাধিকারকর্মীরা যারা সমকামী ও আদিবাসী গোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে সোচ্চার ছিলেন তাদের মধ্যে এটি দৃশ্যমান। প্রায় ২০ বছর ধরে সমকামী হিসেবে স্বীকৃতির (স্বাস্থ্য সেবা এবং মানবাধিকার) লড়াই যা কিনা "চলমান সাফল্য এবং বিজয়" হিসেবে পরিচিত ছিল, সেসব মানবাধিকারকর্মীদের অনেকেই আন্দোলনে এখন বিচ্ছিন্নতাবোধ করছেন– শুধু একে অন্যের সাথে নয়, সর্বোপরি পুরো মানবাধিকার সম্প্রদায়ের সাথে। মানবাধিকারকর্মীরা ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্সকে জানান, তিন বছর আগে "রূপবান" এর কপির জন্য প্রায় ৫০০ জন অনুরোধ জানিয়েছিল। জুলহাজ মান্নানের হত্যার পর বেশ কয়েকজন কর্মী যারা উক্ত ম্যাগাজিনের সাথে যুক্ত ছিলেন, তারা এ ক্ষেত্রে তাদের যোগাযোগের সমস্ত প্রমান মুছে বা ধ্বংস করে ফেলে। আগের পাঠকরা তাদের ফেসবুক, ইনস্ট্রাগ্রাম, টুইটার ও ব্যক্তিগত ফোনের যোগাযোগের তালিকা থেকেও সক্রিয় কর্মীদের নাম ঠিকানা মুছে ফেলে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত লেখার প্রচার হ্রাস: মানবাধিকারকর্মীরা জানান যে, ২০১৩ সালে হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার পর থেকে হাতেগোনা পাঠক তাদের ব্লগে লেখা পড়ছেন এবং মন্তব্য করছেন। এমনকি মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজে প্রকাশ্যে সমর্থন আর না দেয়ার কারণে পাঠকদের কাছ থেকে দুঃখ প্রকাশ করে বার্তাও পেয়েছেন বলে অনেকে জানান। পাঠকরা মানবাধিকারকর্মীদের জানান যে তারা উগ্রবাদীদের হামলা ও রাষ্ট্র কর্তৃক হয়রানির ভয়ে এমনটা করেছেন এবং এক্ষেত্রে তারা চলমান বাক-স্বাধীনতার কঠোরতার কথা উল্লেখ করেন। ঝুঁকিপূর্ণ মানবাধিকারকর্মীদের সাথে সম্পৃক্ততা ও লেখালেখি প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে ধীরে ধীরে কর্মীদের মানবাধিকার সংক্রান্ত লেখালেখির প্রচার ও প্রকাশ হ্রাস পেতে থাকে; এর ফলে ২০১৩ সালের পূর্বে নারী অধিকার ও ধর্মের স্বাধীনতা বিষয়ক বাংলা লেখালেখির পাঠ কমে যেতে থাকে।

২৬ http://www.bahrainrights.org/issue/term/16

বিপন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পাওয়া: বাংলাদেশের জনজীবন, রাজনীতি ও সংবাদমাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পায় এবং এর কারণ ছিল মানুষের মনে ভয় এবং লেখালেখি হ্রাস পাওয়া।

- ঢাকায় অ্যাডভোকেসির কাজ করা আদিবাসী অধিকারকর্মীরা জানান– একের পর এক হত্যাকাণ্ডের ও সুরক্ষার অভাবের কারণে তারা বিশেষভাবে তাদের ঢাকার বাইরের কাজ, আদিবাসী গোষ্ঠীর সাথে সভা-আলোচনা ইত্যাদি বাদ দিয়েছেন; এছাড়া নিজের কাজে ও ঢাকার বাইরে যাওয়াও বন্ধ করেছেন।
- দুই বছর আগে বয়েজ অব বাংলাদেশ ও রূপবান এইচআইভি পরীক্ষার জন্য একটি প্রোগ্রাম প্রকাশ্যে আয়োজন করে এবং ৪০০ জনেরও বেশি লোক এতে যোগ দেয়। সমকামী অধিকারকর্মীদের নেটওয়ার্কে ভাঙ্গনের কারণে এ ধরনের অনুষ্ঠান আবার আয়োজন বিপজ্জনক এবং প্রায় অসম্ভব। মানবাধিকারকর্মীদের মতে, তারা যদি চেষ্টাও করে তাদের সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের এখন ভয় পায় এবং তারা এ ধরনের অনুষ্ঠানে আসবে বলে কর্মীদের এখন মনে হয় না। তাদের আশঙ্কা, এর নেতিবাচক প্রভাব দেশের সমকামী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার অধিকারের ওপর পড়বে।
- সমকামী অধিকারকর্মীরা বলেন "২০ বছরের আন্দোলন এখন মৃত", এমনকি তাদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের অর্জনও ভয় ও সম্প্রদায়ের অসম্পৃক্ততার কারণে হুমকির মুখে।

> **আগে, আমাদের অনুষ্ঠানে লোকজন আসতো কখনো শতাধিক। এটি একটি ব্যাপক সাফল্য ছিল, আমাদের সমাজে এটা হওয়ার ছিল, সমকামী মানুষদের এগিয়ে আসার জন্য। আমাদের পক্ষের লোকজন এগিয়ে আসতো। জুলহাজের মৃত্যুর পর তারা অনেক ভীতসন্ত্রস্ত। আমাদেরকে ভয় পায়– তারা আসবে না। – সমকামী অধিকারকর্মী, ঢাকা**

রঙধনু র‍্যালি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ছবি: রূপবান

জবানবন্দি: আদিবাসী অধিকার কর্মী

আদিবাসী অধিকারকর্মী সঞ্জীব দ্রং জানান, যখন থেকে বাক-স্বাধীনতার ওপর আইনগত কড়াকড়ি আরোপ হয়েছে তখন থেকে তার শঙ্কা বেড়েছে। বর্তমানে তাঁর সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে– আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক আটকের পরও স্বীকার না করা যে আটককৃত ব্যক্তি তাদের হেফাজতে আছে; এমনকি গ্রেফতার ও অপহরণও হয়ে থাকে। সঞ্জীব দ্রং ঢাকার বাইরে তার ও তার সম্প্রদায়ের সহকর্মীদের যাতায়াত কমিয়ে দেন; যে ধরনের অনুষ্ঠানে তিনি বা তার সহকর্মীরা প্রতিনিয়ত যোগ দিতেন তা এখন প্রায়ই মানা করে দেন। ফলস্বরূপ, কিছু প্রান্তিক সম্প্রদায়ের লোকজন এখন আগের মতো প্রশিক্ষণ, নেটওয়ার্কিং ও উন্নয়নের সুযোগ পাচ্ছে না। দ্রং তার বাসস্থানে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছেন; তিনি তার ঢাকার বাইরের সহকর্মীদের ঢাকায় যাতায়াত নিরুৎসাহিত করছেন কারণ এতে ঝুঁকির পরিমান আরও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সঞ্জীব দ্রং যেসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন তারা জানান, যখন থেকে দ্রং এর আদিবাসী এলাকায় যাতায়াত কমে গেছে তাদের জমি দখল ব্যাপক হারে বেড়েছে। জনগোষ্ঠীর লোকজন দ্রংকে জানান, তাদের বিশ্বাস যে তার প্রকাশ্যে কাজ ও আন্দোলন কমে যাওয়ার কারণে জমি দখলকারীদের সুযোগ বেড়েছে।

> হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সরকারের যে প্রতিক্রিয়া তা অনেকটা এরকম– হত্যাকারীদের শাস্তি না দিয়ে মানবাধিকারকর্মীদের শাস্তির আওতায় আনা; এবং এটি হত্যাকারীদের এক ধরনের বার্তা দেয়– এ ধরনের ঘটনা মানবাধিকারকর্মীদের এ বার্তা দেয় তারা সুরক্ষিত থাকবে না, তাদের সম্প্রদায়ের লোকজনের এবং অন্যদের কাছে বার্তা যায় যে মানবাধিকারকর্মীদের মুল্যায়ণ হবে না। আমার সম্প্রদায় ও অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন প্রতিনিয়ত যে লঙ্ঘনের মুখোমুখি হই তা হলো জমির জবরদখল। কারণ যেভাবে আমি আগে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এলাকায় যাতায়াত করতাম, লেখালেখি করতাম বা অনুষ্ঠান আয়োজন করতাম, তা এখন আর করতে পারি না। আমার সম্প্রদায়ের লোকজন ভাবে যে আমি তাদের ত্যাগ করেছি এবং জমি দখলকারীরা ভাবে যে তারা যা খুশি করতে পারে। একদিক থেকে তাদের কথা ঠিক।"

জবানবন্দি: আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধিকারকর্মী

খুশী কবির একজন নারী ও আদিবাসী অধিকারকর্মী। ১৯৭২ সালে তিনি দেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রথম এনজিওগুলোর মধ্যে একটিতে যোগদান করেন এবং বেশ কয়েকদশক ধরে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ঢাকায় বসবাসরত হলেও প্রায়ই ঢাকার বাইরে আদিবাসী এলাকা পরিদর্শন করে থাকেন।

> *আমি ঢাকার বাইরে গ্রামে অনেক কাজ করি এবং যতখানি দেখি তা খুব চিন্তার বিষয়। গ্রামে রক্ষণশীলতা, ধর্মের কঠোর রূপ ও তার প্রয়োগ (ইসলাম) দিনদিন বেড়ে চলেছে। ঢাকার মানুষজন হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানে এবং এ কারণে সংখ্যালঘু বিশেষ করে সমকামী মানুষদের মাঝে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। তারা সব সময় ঝুঁকিতে ছিল, কিন্তু এখন তারা দেখতে পাচ্ছে যে কিভাবে সুপরিচিত মানবাধিকারকর্মীদের হত্যা করা হয়েছে এবং আন্দোলন হঠাৎ থেমে গেছে। তাদের যতখানি প্রতিনিধিত্ব ছিল বলে তারা মনে করতো তা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।*

জবানবন্দি: সমকামী অধিকারকর্মী

ঢাকার একজন সমকামী অধিকারকর্মী জানান, জুলহাজ মান্নানের মৃত্যু উক্ত সম্প্রদায়ের একসাথে কাজ করা, একত্র হওয়া, মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন ও অ্যাডভোকেসি উদ্যোগ ও উন্নয়ন ইত্যাদিকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করে দিয়েছে।

> *আমি মনে করি জুলহাজ কর্মী হিসেবে জন্মেছিল– তার ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে লোকে তার কথা শুনতো। এমনকি "রূপবান" ম্যাগাজিন আমরা শুরু করার আগে জুলহাজ সবাইকে এক করার জন্য সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল। তার সবার সাথে ভালো যোগাযোগ ছিল। আমরা ম্যাগাজিনের প্রথম প্রকাশনার ৪০০ কপি বিতরণ করতে পেরেছিলাম তার যোগাযোগ দক্ষতার কারণে। এখন আমি ফেসবুকে লেখা প্রবন্ধ শেয়ার করার জন্য মানুষজনের উৎসাহ দেখিনা।" -সমকামী অধিকারকর্মী, ঢাকা*

সুপারিশমালা

উপরোল্লেখিত বিষয়াবলির আলোকে *ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডারস* **বাংলাদেশ সরকারের** প্রতি নিম্নলিখিত সুপারিশ মালা তুলে ধরছে:

- মানবাধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের তড়িৎ, পূর্ণ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা এবং হত্যাকাণ্ডের শিকার মানবাধিকারকর্মীদের সহকর্মী, তাদের পরিবারের সদস্যদের এসব মামলার তথ্য ও অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- সমাজে মানবাধিকারকর্মীদের ইতিবাচক ভূমিকা, তাদের কাজের গুরুত্ব এবং ন্যায্যতার প্রকাশ্য স্বীকৃতি প্রদান করা।
- ২০০৬ সালের আইসিটি এ্যাক্ট এবং ২০১৩ সালের সংশোধনীতে যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারকর্মীদের আইনসঙ্গত কাজকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে– এমন কয়েকটি ধারা বিশেষ করে ৫৪, ৫৬, ৫৭ এবং ৬০ বাতিল করা।
- মানবাধিকারকর্মীদের ওপর খসড়া ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা, বিশেষ করে যে অংশটিতে একজন সদস্যের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত 'অপরাধে'র কারণে পুরো সংগঠনকে দায়বদ্ধ করা হয়েছে এবং মানবাধিকারকর্মীদের আন্ত-সহযোগীতা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি করা হয়েছে।
- মানবাধিকারকর্মীরা তাদের বিরুদ্ধে হয়রানী, আক্রমণ এবং হত্যা হুমকির বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে তা যেনো গ্রহণ করা হয় এবং খতিয়ে দেখা হয়– তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় পুলিশকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- পুলিশ কর্মকর্তাদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে বিশেষ করে, নারী মানবাধিকারকর্মীরা তাদেও বিরুদ্ধে আসা হুমকির বিষয়ে থানায় অভিযোগ করতে গেলে তা যেনো গ্রহণ করা হয় এবং আমলে নেওয়া হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ঝুঁকির মধ্যে থাকা মানবাধিকারকর্মীদের সুরক্ষার জন্য একটি নীতি-কাঠামো তৈরির বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে, যেখানে নারী মানবাধিকারকর্মী, যৌন সংখ্যালঘু মানবাধিকারকর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কার্যকরভাবে সাড়া দেওয়া হবে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারকর্মীদের সুরক্ষা বৃদ্ধি, মানবাধিকারকর্মীদের জন্য আলাদা ডেস্ক স্থাপন; যার এখতিয়ার থাকবে মানবাধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে আসা হুমকি আমলে নেওয়া এবং ব্যবস্থা নেওয়া।

উরোপিয় ইউনিয়নের ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের নারী অধিকার, শ্রম অধিকার এবং মানবাধিকারকর্মীদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের কাজের জায়গা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ইউরোপিয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশ সম্প্রতি ঝুঁকির মধ্যে থাকা মানবাধিকারকর্মীদের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে কিছু দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ***ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডারস***-এর সাথে কথা বলেছেন এমন মানবাধিকারকর্মীদের বেশিরভাগই ইউরোপিয় ইউনিয়নের সচরাচর সহায়তা সম্পর্কে অবগত নন। মানবাধিকারকর্মী বিষয়ক ইউরোপিয় ইউনিয়নের নির্দেশিকা বাস্তবায়নের কাঠামোতে ইউরোপিয় ইউনিয়নের উচিত:

- মানবাধিকারকর্মীদের সাথে যোগাযোগ, বিশেষ করে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য ব্যবহার করে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এমন মানবাধিকারকর্মীদের সাথে যোগাযোগের জন্য সুসংগঠিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- বাংলাদেশে ইউরোপিয় ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের সাথে মানবাধিকারকর্মীদের নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- মানবাধিকারকর্মীদের জন্য ইউরোপিয় ইউনিয়নের সহায়তার বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানান দেয়া– মানবাধিকারকর্মীদের আইনসঙ্গত কাজকে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে এবং মানবাধিকারকর্মীদের অধিকার লঙ্ঘনের নির্দিষ্ট ঘটনাগুলো বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নজরে আনার মাধ্যমে।
- বাংলাদেশ সরকারের সাথে মানবাধিকার বিষয়ক চলমান আলোচনাকে মানবাধিকারকর্মীদের আইনি সুরক্ষা বিষয়ে উদ্বেগ জানানোর সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো এবং ঘটে যাওয়া হামলার বিষয়ে স্বাধীন ও স্বচ্ছ তদন্ত করার জন্য আহবান জানানো।

- মানবাধিকার কর্মীদের আইনসঙ্গত কাজ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করা আইনসমূহ বিশেষ করে ২০১৩ সালের সংশোধিত আইসিটি আইনের ধারা ৫৪, ৫৬, ৫৭ এবং ৬০ সম্পর্কে সমালোচনা অব্যাহত রাখা।
- প্রস্তাবিত ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন ২০১৬, বিশেষ করে সেসব ধারা যেখানে কোনো প্রতিষ্ঠানের একজন কর্তৃক সংঘটিত মতপ্রকাশ সংক্রান্ত 'অপরাধে'র জন্য পুরো প্রতিষ্ঠানকে দায়ি করার কারণে মানবাধিকারকর্মীদের মধ্যকার সম্পর্ককে বাধাগ্রস্থ করে, এসব বিষয়ে গভীর উদ্বেগ জানানো।
- মানবাধিকার কমিশনে মানবাধিকারকর্মীদের জন্য আলাদা ডেস্ক স্থাপনের বিষয়ে কমিশনকে সহায়তা করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ মানবাধিকারকর্মীদের সুরক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং বাংলাদেশে মানবাধিকারকর্মীদের সুরক্ষা-নীতি-কাঠামোর জন্য অর্থায়নের সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানো।